

ভারতের অমর গণিতাচার্য

নন্দলাল মাইতি

ভারতের অমর গণিতাচার্য

নন্দলাল মাইতি

মণ্ডল এ্যাণ্ড সন্স

১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট

কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

প্রকাশক :
শ্রীসুধীর কুমার মণ্ডল
১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০ ৭৩

প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর, ১৯৮৫

প্রচ্ছদ : কুমার অজিত

মুল্য : ১৫·০০ টাকা

মূদ্রাকর :
স্বর্ণলতা ঘোষ
ঘোষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৫৭/২, কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০ ০০০৯

উৎসর্গ

মা

শ্রীমতী যামিনী মাইতি ;

মাসীমা

শ্রীমতী লিলি কর

শ্রীচরণেষু

সূচীপত্র

বিষয়		পৃষ্ঠা
কথা শুরু	....	
লেখন ও প্রাচীন সংখ্যা	....	৩
বিশ্বগণিতে দুটি অমূল্য রত্ন	....	৫
দশগুণোত্তর স্থানীয় মান পদ্ধতির গুরুত্ব ও তাৎপর্য	....	৬
শূন্য আবিষ্কার	....	৮
জ্যামিতি	....	৮—১৬
বৌধায়ন ; কাত্যায়ন ; আপস্তম্ব ; মানব ; কয়েকটি সম্পাদ্য ও উপপাদ্য ; ভারতীয় জ্যামিতি ও পীথাগোরাস		
জৈনদের গণিতপ্রীতি	....	১৬—২০
ভদ্রবাহু ; উমাস্বাতী ; তত্ত্বার্থাধিগম-সূত্রে কয়েকটি সূত্র		
প্রথম আর্যভট	....	২০—২৭
আর্যভট না আর্যভট্ট ; দেশ-কাল-জন্ম . আর্যভটীয় ; দু-একটি উজ্জ্বল কৃতিত্ব বর্ণমালার সাহায্যে সংখ্যা প্রকাশ ; পাই (π)-এর মান		
বরাহমিহির	....	২৭—৩২
বরাহমিহিরের পরিচয় ; বিদেশ ভ্রমণ ; গল্প-কাহিনী ; অবদান ও কৃতিত্ব ; আসামীর কাঠগোড়ায়		
প্রথম ভাস্কর	....	৩৩—৩৫
ভাস্কর পরিচিতি ; গ্রন্থ পরিচয় ও প্রভাব ; গুরু প্রশস্তি ; পাণ্ডিত্য ও বৈশিষ্ট্য		

গণক-চক্র-চূড়ামণি ব্রহ্মগুপ্ত .... ৩৫—৪২

জীবনী সূত্র ; ব্রহ্ম-স্ফুট-সিদ্ধান্ত ; গণিতে অবদান ; বীজগণিতে কৃতিত্ব ; যে-কোন সংখ্যার বর্গ নির্ণয়ের সূত্র ; জ্যামিতিতে অবদান ; ব্রহ্মগুপ্তের চতুর্ভুজ

বররুচি ৪২

হরিদত্ত ৪৩

আচার্য লল্ল ৪৪

আচার্য শ্রীধর .... ৪৮—৫১

অবদান ; পরিচয় ; শ্রীধর বিশেষণ

আচার্য মহাবীর .... ৫১—৫৮

মহাবীরের রাজসম্মান ; গ্রন্থ পরিচয় ; পাটীগণিত কত মজার ; বীজগণিতের সামান্য মজা ; পরিমিতি ও জ্যামিতি নিয়ে দু-চার কথা ; জৈনদের গণিত চর্চা নিয়ে

দ্বিতীয় আর্যভট ৫৮—৬০

আর্যভট ক'জন ছিলেন ? ; মহাসিদ্ধান্ত

শ্রীপতি ৬০—৬২

গ্রন্থ পরিচয় ; অবদান

ভাস্করাচার্য ৬৩—৭৪

পরিচয় ; শ্রেষ্ঠ কীর্তি ; বিনয়ী ভাস্কর ; লীলাবতী অংশে কি আছে ? ; বীজগণিত নিয়ে দু-চার কথা ; ভাস্করের শূন্য-ভাবনা ; জ্যামিতি নিয়ে নতুন ভাবনা ; ভাস্কর ও নিউটন ; লীলাবতী কিংবদন্তী

নারায়ণ পণ্ডিত .... ৭৪—৭৮

রচনা ; অসাবধানতা ; নতুন কথা ; এক পা এগিয়ে

পৃথূদক স্বামী .... ৭৮—৮০

অন্ধ ভক্ত নয় ; জ্ঞান তপস্বী

পরমেশ্বর .... ৮০—৮৫

দক্ষিণ ভারতে গণিতচর্চা ; নাম-গোত্র-পরিচয় ; রচনাপঞ্জী ; বিশিষ্টতা ; বিজ্ঞান মানসিকতা ; পারিবারিক ঐতিহ্য ;

নীলকণ্ঠ সোমযাজী .... ৮৫—৯০

কুল পরিচয় ; শ্রদ্ধা এ-যুগ সে-যুগ ; ষড় দর্শন পারঙ্গত ; লক্ষণ ভাই ; সুপুত্রের পিতা ; বন্ধুপ্রীতি ; রচনা ও কৃতিত্ব

শুভঙ্কর .... ৯০—৯৪

অচ্যুত পিষারতি .... ৯৪—৯৫

বিচিত্রপ্রতিভা , আদর্শ শিক্ষক

কয়েকটি গণিতজ্ঞ পরিবার .... ৯৫—১০৮

ইউরোপে উদাহরণ ; ঐতিহ্য ও বৈশিষ্ট্য ; সামান্য পুনরাবৃত্তি , গঙ্গাধর পরিবার ; জ্ঞানরাজ পরিবার ; কেশব পরিবার , দিবাকর পরিবার ; বল্লাল পরিবার ; আধুনিক গণিতের পূর্বাভাস ; টেলার নিউটন লিবনিজের পূর্বে

সোয়াই জয় সিংহ .... ১০৮—১১৫

জীবন কথা ; কীর্তিগাথা : ভারতীয় যন্ত্রপাতি ও উত্তরাধিকার ; কয়েকটির নাম ও অবস্থান ; উপসংহার


ভারতীয় গণিতের
বিকাশ স্থান সমূহ
পুরুষপুর
মূলতান
কুরুক্ষেত্র
ইন্দ্রপ্রস্থ
জয়পুর
পাটলিপুত্র
মগধ
মালব
অবন্তী
উজ্জয়িনী
বলভী
নর্মদা নং
নাসিক
অশ্মক
গোদাবরী নং
কৃষ্ণা নং
বিজাপুর
কাবেরী নং
তাম্রলিপ্ত

লেখকের কথা

এ বই গণিতের ইতিহাস নয়। ইতিহাসের ধারাবাহিকতা এতে নেই। প্রাচীন ভারতের কিছু অতি পরিচিত, এবং কিছু অল্প পরিচিত গণিতজ্ঞদের কথা এখানে বলা হয়েছে। তাঁদের জীবনের টুকরো টুকরো সংবাদ এতে পরিবেশিত হয়েছে। আর গণিতে তাঁদের বিশেষ অবদানের ইঙ্গিত করা হয়েছে মাত্র। প্রাচীন ভারতের গণিতাচার্যরা প্রায় সকলেই মূলত জ্যোতির্বিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা করেছেন। কিন্তু এখানে জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্বন্ধে কিছু বলা হয়নি—প্রসঙ্গক্রমে দু-একটি মন্তব্য করা হয়েছে।

প্রাচীন ভারতের কোন কোন গণিতাচার্যদের সম্বন্ধে কিছু কিংবদন্তী, গল্প-কাহিনী প্রচলিত রয়েছে। এ সবের কোন ঐতিহাসিক মূল্য নেই। তবু আলোচনায় স্থান পেয়েছে এইজন্য যে, যাতে আলোচিত বিষয় আকর্ষণীয় হয়—তথ্য ছাড়াও কিছু গল্প-কাহিনীর আমেজ লাভ করা যায়। অবশ্য, নবীন পাঠক যাতে ভুলের ফাঁদে না পড়েন, তাই সত্যাসত্য নিয়ে মন্তব্য রয়েছে।

বিজ্ঞানের যেমন নিজস্ব ভাষা আছে, গণিতেরও তেমনি নিজস্ব ভাষা আছে। গণিত নিয়ে বলতে গেলে তাই পরিভাষা এসে পড়ে। প্রাচীন ভারতীয় গণিতে ব্যবহৃত পরিভাষা আধুনিক যুগের গণিতের থেকে পৃথক। কিন্তু আলোচনায় সেই পরিভাষা এড়িয়ে চলার চেষ্টা করা হয়েছে—আধুনিক ভাষায় প্রকাশ করার চেষ্টা করা হয়েছে। তবুও কিছু কিছু থেকে গেছে, খুব অল্প হলেও!

গণিতের ইতিহাস বা প্রাচীন ভারতের গণিতের ইতিহাস সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত নয়। স্বাভাবিকভাবেই অনেকের ভারতীয় গণিত সম্বন্ধে অনেক কিছুই অজানা। কিন্তু ভারতীয় গণিত, বিশ্বগণিতে এর স্থান ও অবদান আমাদের পক্ষে গৌরবের। তাই শিক্ষাবিদরা

গণিত পড়ানোর সময় প্রাসঙ্গিক অংশের অবতারণা করার পরামর্শ দেন। অঙ্ক পড়াতে গিয়ে প্রাসঙ্গিক বই-এর অভাববোধ করেছি। সেইজন্য দীর্ঘদিন ধরে এ-বিষয়ে তথ্যানুসন্ধান করে শিক্ষাদান কার্য যতটুকু সম্ভব আকর্ষণীয় করে তোলার প্রয়াস পেয়েছি। এবং এই কাজটি করতে গিয়ে ইতিপূর্বে 'প্রাচীন ভারতীয় গণিতের ইতিবৃত্ত' নামে একটি বই লিখে অনেকদিনের অভাব পূরণ করার প্রয়াস পেয়েছি। কিন্তু এই বইটি সে-ধরনের নয়। ছাত্র-ছাত্রী থেকে শুরু করে সাধারণ পাঠক যাতে এ-বিষয়ে সামান্য পরিচয় লাভ করতে পারেন, সেভাবেই এটি লেখা হয়েছে। স্কুল গণিতের গণ্ডীর বাইরে কোন তথ্য বা তত্ত্ব আলোচিত হয়নি এখানে।

গণিতে শিক্ষার্থী বড় অনাগ্রহী। গণিতে আতঙ্ক, ভীতি ও বিরাগ বাস্তব সমস্যা। এই সমস্যা বাড়ছে বই কমছে না। কিন্তু আজকে এই ক্রমবর্ধমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সম্প্রসারণের যুগে গণিতকে এড়িয়ে চলার উপায় নেই। দেশের সমৃদ্ধি ও উন্নতি যে বিজ্ঞাননির্ভর, তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু দক্ষতা—বিশেষ দক্ষতা ছাড়া সৃজনশীল বিজ্ঞানী ও দক্ষ প্রযুক্তিবিদ হওয়া যায় না। কিন্তু এদিকে সকলের দৃষ্টি নেই।

অতি বাস্তব এই সমস্যাটির সমাধানের জন্য নানা ব্যবস্থার কথা বলা হয়। অথচ প্রকৃত উদ্যোগ চোখে পড়ে না। দেশ-বিদেশের গণিতজ্ঞদের জীবনী ও তাঁদের আবিষ্কার কম আকর্ষণীয় নয়। যেমন, রেনে দেকার্তে অনেকদিন বুঝতেই পারেননি যে, গণিতে তাঁর বিশেষ ক্ষমতা আছে। কিন্তু হঠাৎ একটি সমস্যা সমাধান করে গণিতে আগ্রহী হয়ে মহৎ আবিষ্কার করলেন। গণিতে আগ্রহ ও অনুরাগ সৃষ্টি হলে বিষয়ে গভীর অধিকার অর্জন করা যায়। এই আগ্রহ ও অনুরাগ বৃদ্ধির আশায় বইটি লেখা হয়েছে। আমাদের সুপ্রাচীন গাণিতিক ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতি শিক্ষার্থীকে শ্রদ্ধাশীল করে তোলার প্রয়াস করা হয়েছে।

এ ধরনের বই লেখায় আমার প্রেরণা দিয়েছেন ডঃ প্রদীপকুমার মজুমদার। তা ছাড়া শুভঙ্করের উপর প্রবন্ধ দিয়ে আমায় সাহায্যও করেছেন। তাঁকে নমস্কার ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

ডাঃ কালাচাঁদ রায়, প্রণতি রায়, সুব্রত কর ও অনীতা কর আমায় অধ্যয়নের সুযোগ ও পরামর্শ দানে কার্পন্য করেননি। এঁরা অশেষ ধন্যবাদের পাত্র। এ ধরনের বই লেখার জন্য উৎসাহদানে শৈব্যা প্রকাশনের কর্ণধার ও 'কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুত রবীন বল কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদের পাত্র।

সব সময়েই মনে হয়েছে কাজটি কঠিন—সহজসাধ্য নয়। কিন্তু কঠিন ও দুরূহ বলে ছেড়ে দেওয়া যায় না। তাই এই বইটিতে আমার উদ্দেশ্য ও লক্ষ কতটা সফল হবে বলা যায় না। সাধারণ পাঠক, ছাত্র-ছাত্রীরা বইটি আগ্রহভরে পড়লে ও উৎসাহিত বোধ করলে তবে এ-প্রয়াস সার্থক হয়। বইটির উৎকর্ষ বৃদ্ধিতে গঠনমূলক পরামর্শ কৃতজ্ঞতার সহিত গৃহীত হবে।

মণ্ডল এণ্ড সন্সের শ্রীসুধীরকুমার মণ্ডল, শ্রীশঙ্কর মণ্ডল ও শ্রীহরিচরণ মণ্ডল বইটি সুন্দরভাবে প্রকাশে সর্ব দায়িত্ব গ্রহণ করায় তাঁদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। বইটি যথাসম্ভব নির্ভুল মুদ্রণে ও প্রুফ দেখায় আমায় সাহায্য করেছেন মণ্ডল এণ্ড সন্সের কর্মী শ্রীজগন্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁকে ধন্যবাদ জানাই। তবুও বইটি নির্ভুল করতে পারিনি। তার জন্য ক্ষমাপ্রার্থী।

নন্দলাল মাইতি

নভেম্বর, ১৯৮৫

"ত্রিলোকে স্থাবর-জঙ্গমের মধ্যে যা কিছু আছে
কোন কিছুই গণিত বহির্ভূত নয়।"

—মহাবীরাচার্য

লেখকের অন্যান্য বই :

গণিতের কথা ও কাহিনী

গণিতের ললিত পাঠ

প্রাচীন ভারতীয় গণিতের ইতিবৃত্ত

ভারতের অমর গণিতাচার্য

কথা শুরু

এই আমাদের সুমহান দেশ—ভারত। নানা বৈচিত্র্যে, ঐতিহ্যে ও সংস্কৃতিতে ভরা। রাজ্যে রাজ্যে নানা ভাষা, আচার-ব্যবহার আর আচরণে কত পার্থক্য ! এমন কি, ধর্মমতেও সবাই এক নয়। বেশীর ভাগ মানুষ হিন্দু হলেও বৌদ্ধ, জৈন, শিখ, খ্রীস্ট ধর্মের মানুষ একত্রে অবস্থান করছে। সহাবস্থান ও সংহতির এমন দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া ভার। গুজরাটী-পাঞ্জাবী-মাদ্রাজী-বিহারী-বাঙালী ইত্যাদি বলে আমাদের যে পরিচয় তা, অতি ক্ষুদ্র গণ্ডীতেই সীমাবদ্ধ। বিশ্ববাসীর কাছে আমাদের একটিমাত্র পরিচয়, আমরা ভারতীয়।

এদেশের সুপ্রাচীন ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি আমাদের যেমন গৌরবের তেমনি গর্বের। আমরা সবাই তার উত্তরাধিকারী। অতীত ভারতের গৌরবময় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিতে গর্ববোধ করে না, এমন একজন ভারতীয়ও নেই।

অতীতে বিশ্বে খুব কম দেশই সভ্য ছিল। বিশ্বের প্রাচীন ইতিহাসে দেখা যায় মাত্র চারটি দেশ সভ্যতা ও সংস্কৃতির অধিকারী ছিল। এই চারটি দেশ মিশর, ব্যাবিলন, ভারত ও গ্রীস। প্রথম তিনটি দেশের সভ্যতা খুবই প্রাচীন। তুলনায় গ্রীক সভ্যতা নবীন অর্থাৎ অনেক পরে বিকশিত হয়েছে। আজ যে উজ্জ্বল পাশ্চাত্য সভ্যতা আমরা দেখতে পাই তার মূলে গ্রীকসভ্যতার অসামান্য অবদান রয়েছে।

সংস্কৃতি কেবলমাত্র একটি উপাদানে গড়ে ওঠে না। তার উপাদান অনেক। বহু নদীর ধারায় যেমন সমুদ্রের মহিমান্বিত রূপ, তেমনি সঙ্গীত-নাটক-নৃত্য-কাব্য-সাহিত্য-দর্শন-বিজ্ঞান ইত্যাদি বহু উপাদানে গড়ে ওঠে সংস্কৃতি।

ঐশ্বর্যশালী সংস্কৃতি গড়ে উঠতে হলে তার উপাদানসমূহ অবশ্যই সমৃদ্ধ হবে। ভারতের সুমহান সংস্কৃতির দিকে তাকালে দেখা যায়, তার উপাদানসমূহ আশ্চর্য রকমের সমৃদ্ধ। কাব্য-সাহিত্য-দর্শন-বিজ্ঞান ইত্যাদি সবই এমন সমৃদ্ধ ও ঐশ্বর্যপূর্ণ যে, তা বিশ্ববাসীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে পেরেছে। বিশ্বসংস্কৃতির নিরিখে আমাদের সংস্কৃতি মর্যাদা ও সম্ভ্রমের আসনে সমাসীন।

বেদ-বেদান্ত, ন্যায়, বৈশেষিক, জৈন, বৌদ্ধ ইত্যাদি ধর্মগ্রন্থ ও দর্শনের নাম শোনেনি এমন শিক্ষিত মানুষ নেই। কালিদাস-ভবভূতি-মাঘ-বাণভট্ট প্রমুখ মহাকবিদের খ্যাতি বিশ্বব্যাপী। চিকিৎসাবিজ্ঞানে চরক-সুশ্রুত-ধ্বন্বন্তরী-বাগভট্ট, জ্যোতির্বিজ্ঞান ও গণিতে আর্যভট-ব্রহ্মগুপ্ত-ভাস্করাচার্য প্রমুখ উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কস্বরূপ। অতীতে এঁদের অনেকের খ্যাতি দেশের সীমা ছাড়িয়ে বিদেশে পৌঁচেছিল। যে-যুগে যাতায়াত ও যানবাহন ইত্যাদিতে কোন সুবিধা ছিল না, সে-যুগে আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন কীরূপ বিস্ময়কর প্রতিভা থাকলে সম্ভব, তা সহজেই অনুমান করা যেতে পারে।

অতীতে ভারত বিজ্ঞানের যে-সব শাখায় কৃতিত্ব ও গৌরব অর্জন করেছিল, তাদের মধ্যে আয়ুর্বেদ, জ্যোতির্বিজ্ঞান ও গণিত প্রধান। প্রকৃত বৈজ্ঞানিক ঐতিহ্য গড়ে উঠতে হলে গণিতে উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। যে-দেশের গণিত যত উন্নত ও সমৃদ্ধ সে-দেশ তত বিজ্ঞানে উন্নতি করতে পারে। প্রকৃত বিজ্ঞান, গণিত ছাড়া এক পাও চলতে পারে না। কারণ, গণিত হচ্ছে বিজ্ঞানের প্রধান হাতিয়ার।

সেই সুদূর অতীতকাল থেকেই আমাদের দেশের গৌরবময় গাণিতিক ঐতিহ্য আছে। কত গণিতজ্ঞ জন্মগ্রহণ করেছেন এই দেশে ; তাঁরা গণিতের অনেক নিয়ম ও সূত্রও আবিষ্কার করেছেন। অবশ্য এ-যুগ আর সে-যুগ এক নয়। তাঁদের চিন্তাপ্রণালী ও লিপিবদ্ধ করার পদ্ধতি যে এখনকার গণিতের সঙ্গে মিলে যাবে, এমন আশা করা যায় না। তা না হলেও তাঁদের সব-কিছুই এ-যুগে অচল, তা জানার দরকার নেই বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কারণ, এখনো

আমরা তাঁদের আবিষ্কৃত কিছু কিছু নিয়ম মেনে চলি, অঙ্কেও ব্যবহার করে থাকি।

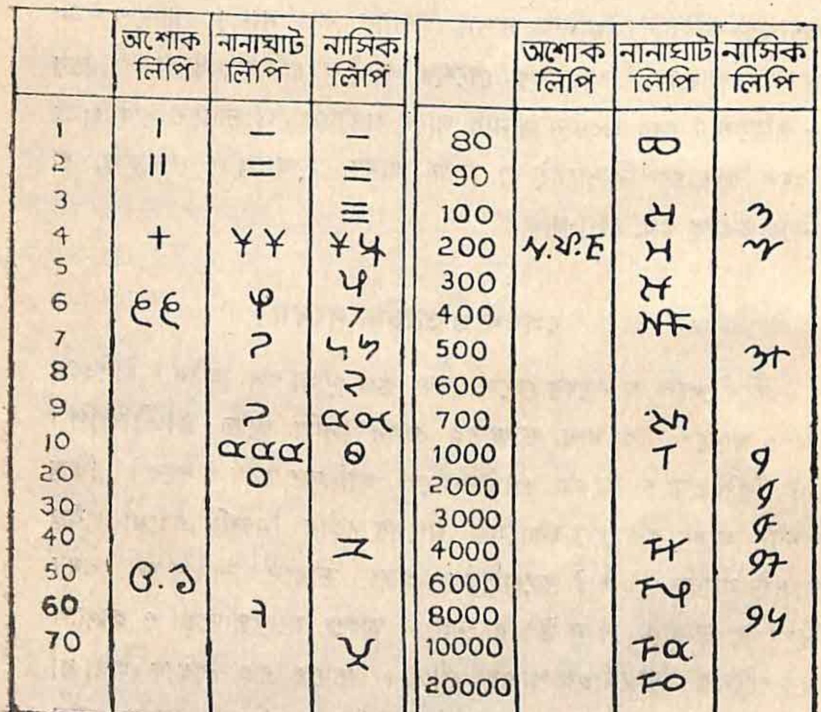
গণিতে তো সংখ্যা নিয়েই কারবার। সংখ্যা ছাড়া কি গণিত বা অঙ্ক ভাবা যায়? সংখ্যা সব এক রকমের নয়, নানা রকমের। তাদের আবার আলাদা আলাদা নামও আছে। মৌলিক সংখ্যা, যৌগিক সংখ্যা, যুগ্ম সংখ্যা, বিযুগ্ম সংখ্যা, স্বাভাবিক সংখ্যা, ধনাত্মক সংখ্যা, ঋণাত্মক সংখ্যা, কাল্পনিক সংখ্যা ইত্যাদি কত নাম! গণিতে যেন সংখ্যার রাজত্ব। আমাদের দেশের প্রাচীন গণিতাচার্যদের পরিচয় ও গণিতে তাঁদের অবদান জানার আগে অতীতকালে ভারতে সংখ্যাগুলি কেমন ছিল এবং কিভাবেই বা আজ আমরা সংখ্যাগুলি পেয়েছি, তা নিয়ে তু-চার কথা বলা যাক।

লেখন ও প্রাচীন সংখ্যা

কবে থেকে আমাদের দেশে লেখা শুরু হলো বলা কঠিন। ইতিহাস থেকে জানতে পারা যায়, ভারতের প্রথম লিপি হচ্ছে **ব্রাহ্মীলিপি**। এই লিপি হয়তো অনেক প্রাচীনকালে আবিষ্কৃত হয়ে থাকবে। কিন্তু সম্রাট অশোকের রাজত্বকালের আগের কোন নিদর্শন এখনো পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। তাই অশোকের আগে ভারতে লিপির রূপ কেমন ছিল, তা জানার কোন উপায় নেই। অবশ্য মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পায় এক ধরনের সীলমোহর পাওয়া গেছে। তাতে এক প্রকার লেখা বা লিপি দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু তুর্ভাগ্যের বিষয়, এখনো পর্যন্ত সিন্ধুসভ্যতায় প্রাপ্ত সীলমোহরে অঙ্কিত লিপি পড়া যায়নি। তাই ভারতে অতি প্রাচীনকালে কিরূপ লিপি ছিল, সে বিষয়ে নিশ্চিত করে কিছু বলা যায় না।

সম্রাট অশোকের সময়কার তু-রকমের লিপি পাওয়া গেছে। একটি ব্রাহ্মীলিপি, আর অন্যটি খরোষ্ঠী লিপি। ভারতে যে সব বর্ণমালা প্রচলিত, তার মূল কিন্তু ব্রাহ্মীলিপিতে। ব্রাহ্মীলিপি থেকে উদ্ভূত বলে আমাদের সংখ্যাগুলির আদিরূপ এই লিপির মধ্যে দেখতে পাওয়া

যায়। অবশ্য এখন আমরা যেমন এক (১), দুই (২), তিন (৩), চার (৪) ইত্যাদি লিখি, ব্রাহ্মীসংখ্যার সঙ্গে এদের মিল সহজে চোখে পড়ে না। কিন্তু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলে গভীর সাদৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। আজ থেকে তেইশ' বছর আগে এক, দুই, তিন ইত্যাদি সংখ্যাগুলি কেমন ছিল, তা নীচের ছবিটি দেখলে বুঝতে পারা যায় :



ব্রাহ্মী সংখ্যা-লিপি

লেখার ছাঁদ বদলায়। বিশ বছর আগে কারুর হাতের লেখা যেমন ছিল, বিশ বছর পরে তেমন থাকে না। অল্প সময়েই যখন এমন হয়, তখন শত শত বছরে যে লেখার ছাঁদ বেশ বদলে যাবে, তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। লিপি যেমন বদলায় তেমনি সংখ্যাও বদলায়। ব্রাহ্মীসংখ্যা সবচেয়ে পুরোনো। তারপর যে সংখ্যা পাওয়া গেছে তার

নাম নানাঘাট সংখ্যা। মধ্যভারতে নানাঘাট পাহাড়ের গায়ে এই সংখ্যা আবিষ্কৃত হয়েছে বলে এইরূপ নামকরণ করা হয়েছে।

কালচক্রে মাস, দিন, বছর কেটে যায়। সময় এগিয়ে চলে, আর সংখ্যাও বদলায়। তবে সব ক্ষেত্রেই যে আমূল পরিবর্তন হয়েছে, তা নয়। গণিতের আবার বিশেষ একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করার মত। পরির্বতন এখানে হয় বটে, তবে ধীরে ধীরে। গণিতের সংরক্ষণ ক্ষমতা খুব বেশী, আর গণিতাচার্যরাও বড় রক্ষণশীল। পরির্বতন মেনে নিতে এঁদের সময় লাগে। সে যাই হোক, আজ থেকে প্রায় দু'হাজার বছর আগে ভারতে সংখ্যাগুলি কেমন ছিল, তার নিদর্শন বোম্বাই-এর নাসিক জেলায় পাওয়া এক শিলালিপিতে দেখতে পাওয়া যায়। প্রাচীন এই সংখ্যাগুলির প্রতি ভাল করে নজর দিলে বুঝতে পারা যায়, কিভাবে ধীরে ধীরে আমাদের সংখ্যাগুলি গড়ে উঠেছে।

বিশ্বগণিতে দুটি অমূল্য রত্ন

গণিতে অবিস্মরণীয় আবিষ্কার খুব কমই ঘটে। যে আবিষ্কার চির অম্লান, চির উজ্জ্বল তেমন আবিষ্কার চিহ্নিত করা বড় কঠিন। গণিতে ভারতের স্থান সম্ভ্রমপূর্ণ, সন্দেহ নেই। কিন্তু অন্যান্য আবিষ্কারের মূল্য তেমন সুদূরপ্রসারী ও তাৎপর্যপূর্ণ না হলেও দুটি আবিষ্কার বিশ্বগণিতের ভাণ্ডারে রত্নস্বরূপ। একটির নাম **দশগুণোত্তর স্থানীয় মান পদ্ধতি** ও অপরটি শূন্য। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, এই মহত্তম আবিষ্কার দুটি আমাদের কোন গণিতাচার্যরা করেছিলেন, তাঁদের গবেষণা সম্পর্কে আমরা কিছুই জানি না। এমন কি, তাঁদের নাম্ পর্যন্ত আমরা জানি না। এটি অবশ্য ভারতীয় রীতি।

অতীতে ভারতীয় আচার্যরা প্রতিষ্ঠা ও খ্যাতির প্রতি ছিলেন বড়ই নিস্পৃহ। তাই জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা ক্ষেত্রে যে-সব গ্রন্থাদি দেখা যায়, সেখানে কোথাও কোথাও তাঁদের নামটুকু ছাড়া ব্যক্তিগত কোন পরিচয় পাওয়া যায় না।

দশগুণোত্তর স্থানীয় মান পদ্ধতির গুরুত্ব ও তাৎপর্য

প্রাচীনকালে মানুষের গণনার যন্ত্র ছিল আঙুল। আমাদের দু-হাতে মোট দশটি আঙুল। এখনো আমরা আঙুল বা আঙুলের পর্ব গণনা করে হিসেব করি। কালক্রমে **দশ**-ই গণনার মূল বা ভিত্তি হয়ে দাঁড়ায়। পণ্ডিতরা মনে করেন, হাতের দশটি আঙুল গণনার মধ্য দিয়েই দশগুণোত্তর পদ্ধতির আবির্ভাব। মাত্র দশটি অঙ্ক—'এক' থেকে 'নয়' এবং শূন্য দ্বারা লিখন-প্রণালী আজ খুব সহজ মনে হলেও সুদূর অতীতে এরকম সহজ ও সরল পদ্ধতি আবিষ্কার করা বিস্ময়কর বৈকি ! যাবতীয় সংখ্যা তা ছোটই হোক আর বড়ই হোক এই পদ্ধতিতে লেখা যায়। বিশ্বের অন্যত্র যে-সব পদ্ধতি ছিল, তা খুবই জটিল। যেমন,—মিশর অতি প্রাচীন সভ্য দেশ। সেখানে 'দশ'-এর জন্য বিশেষ প্রতীক ব্যবহৃত হতো, আর রোমানদের 'দশ'-এর প্রতীক ছিল X। এই প্রতীক এখনো শ্রেণী (class) লিখতে ও ঘড়ির ডায়ালে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়।

ছোট ছোট সংখ্যা, সাল-তারিখ যে-কোন পদ্ধতিতে লেখা যেতে পারে। এসব ক্ষেত্রে পদ্ধতিটি সহজ-সরল কিনা বিবেচনার তেমন দরকার পড়ে না। কিন্তু প্রাচীনকালে ব্যবহৃত পদ্ধতিতে বড় বড় সংখ্যা লেখা সহজ নয়, বরং খুবই জটিল। যেমন,—দশগুণোত্তর পদ্ধতিতে 1748-কে 34 দিয়ে গুণ করা যত সহজ, রোমান পদ্ধতিতে MDCC XLVIII (= 1748)-কে XXXIV (= 34) দিয়ে গুণ করা অত্যন্ত কঠিন। সেইজন্য বলা হয়, দশ বছরের শিক্ষার্থীরা আজ যা করতে পারে, অভিজ্ঞ ও বিদ্বান রোমান সেনেটারদের তা করতে মাথা ধরে যেত।

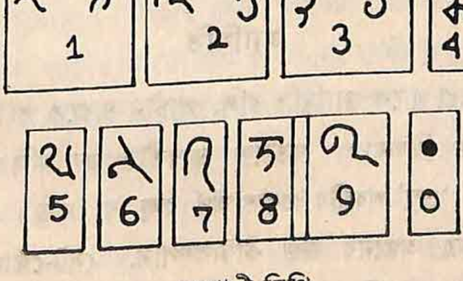
প্রকৃতপক্ষে, রোমান পদ্ধতিতে বড় বড় সংখ্যা লেখা খুব অসুবিধা-জনক। কারণ, এতে বিভিন্ন অঙ্ক ও সংখ্যার জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রতীকের দরকার। এরকম কয়েকটি প্রতীক হলো :

I = 1 ; V = 5 ; X = 10 ; L = 50 ; C = 100 ; D = 500 ; M = 1000 ইত্যাদি।

কিন্তু দশগুণোত্তর পদ্ধতিতে এসবের ঝামেলা নেই। এখানে আছে মাত্র দশটি প্রতীক,—0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ও 9। এদের অঙ্ক (digit) বলে। ইংরেজী **'digit'** শব্দটির একটি অর্থ 'আঙুল'। দশটি প্রতীক নিয়ে যে-কোন সংখ্যা লেখা যায় এই পদ্ধতিতে। আর একটি মস্ত বড় সুবিধা হচ্ছে এখানে **'স্থানিক মান'** বিবেচিত হয়। স্থানিক মান হচ্ছে বিভিন্ন অঙ্কের স্থান বা জায়গা অর্থাৎ কোথায় তারা বসেছে দেখে তাদের মান নির্ণয় করা যায়।

ঠিক কবে এই পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছিল, তা আজ আর বলা সম্ভব নয়। তবে ছশ' থেকে দশ শ' খ্রীস্টাব্দের ভেতরের শিলালিপিতে এই পদ্ধতির প্রচলন দেখতে পাওয়া যায়। ইতিহাস থেকে জানতে পারা যায়, পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ভারতীয় সভ্যতা বিস্তার লাভ করেছিল। সেখানে এখনো ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির চিহ্ন রয়েছে। ভারতীয় গণিতও ওইসব দেশে প্রচলিত হয়েছিল। ওদেশের শিলালিপিতে ভারতীয় সংখ্যার নিদর্শন পাওয়া যায়। তবে তার বয়স আজ থেকে তেরশ' বছর আগের নয়।

বকশালী নামক স্থানে মাটি খুঁড়তে গিয়ে গণিত বিষয়ে একটি পাণ্ডুলিপি আবিষ্কৃত হয়েছে। তার ভাষা ও লিপি তেমন প্রাচীন না হলেও বিষয়বস্তু নিঃসন্দেহে প্রাচীন। এমন কি, আর্যভটের পূর্বেকার বলে অনেকে অনুমান করেন। তাতে নিম্নরূপ সংখ্যা ব্যবহৃত হতে দেখা যায় :



বকশালী লিপি

শূন্য আবিষ্কার

জেলখানায় বন্দী থাকলে কি হয় ? ইচ্ছা-অনিচ্ছা, স্বাধীনতা, সত্তা বলে কিছু থাকে না। ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে থাকার জন্য সঙ্কীর্ণতা বৃদ্ধি পায়। গণিত-জগতেও শূন্য আবিষ্কার না হওয়ার আগে ঠিক এমন অবস্থা ছিল। গণিত তখন ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ ছিল, তার অগ্রগতি পদে পদে ব্যাহত হচ্ছিল। শূন্য আবিষ্কার হওয়ার পর থেকে সংখ্যা লিখনে সুদূরপ্রসারী তাৎপর্য দেখা দেওয়ায় গণিতে অগ্রগতি দেখা দিল। অ্যাবাকাসের ফ্রেম থেকে—হিসাব-নিকাশের ক্ষুদ্রতা থেকে তার মুক্তি ঘটল। বিখ্যাত এক গণিতের অধ্যাপক তাই এই আবিষ্কারকে "নির্বাণ" এর সঙ্গে তুলনা করেছেন। তুলনাটি এমন সুন্দর ও সার্থক যে, বোধ হয় অন্য কোন শব্দ ও বাক্য দিয়ে শূন্যের মহত্ত্ব ও গুরুত্ব বোঝানো কঠিন। শূন্য আবিষ্কারের মূল খুঁজতে গিয়ে এরূপ মনে করা হয় যে, এই অসামান্য ও তুলনাহীন আবিষ্কারটির পিছনে গণিতাচার্য ও দার্শনিকদের যৌথ ভূমিকা রয়েছে।

প্রাচীন ভারতে শূন্যের দুটি রূপ ছিল। একটি বিন্দুরূপ (.) ও অপরটি বৃত্তীয়রূপ (0)। বকশালী পাণ্ডুলিপিতে বিন্দুরূপটি দেখা যায় ; আবার পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে যে সংখ্যার নমুনা পাওয়া গেছে, তাতে বিন্দু ও বৃত্তীয় দুটি রূপই দেখা যায়। কালক্রমে ঋণাত্মক রাশি বোঝাতে বিন্দু ব্যবহৃত হয়, এবং শূন্য বোঝাতে বৃত্তীয় রূপ প্রচলিত হয়। বর্তমানে আমরা এই রূপটি ব্যবহার করে চলেছি।

জ্যামিতি

আজ আমরা যাকে জ্যামিতি বলি, প্রাচীন ভারতে তা কিন্তু জ্যামিতি নামে পরিচিত ছিলনা। অতীতে ভারতীয় জ্যামিতির নাম ছিল '**শুল্বশাস্ত্র**'। 'শুল্ব' শব্দটির প্রকৃত অর্থ রজ্জু বা দড়ি। এখন যেমন জ্যামিতিক চিত্র অঙ্কনের জন্য কাঁটাকম্পাস, সেট-স্কোয়ার ইত্যাদি আছে, সে-যুগে এসব ছিল না। তখন দড়ি দিয়েই সব রকম জ্যামিতিক

চিত্র অঙ্কন করা হতো। প্রাচীন মিশর ও গ্রীসেও জ্যামিতিক ছবি আঁকার জন্য লিলেন বা সুতোর ব্যবহার ছিল।

মিশরে জমির পরিমাপ বা সীমানা নির্দেশ থেকে জ্যামিতির উদ্ভব। গ্রীসে জ্যামিতি চর্চা বুদ্ধি ও যুক্তির অনুশীলনে নিয়োজিত হতো। তাই গ্রীক জ্যামিতি অনেক উন্নত হতে পেরেছিল। সত্যি কথা বলতে কি, এখনো আমরা গ্রীক গণিতজ্ঞ ইউক্লিডের লেখা জ্যামিতি পড়ি। ভারতে জ্যামিতির প্রয়োগ হতো প্রধানত ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপে। বৈদিক ধর্মের অপরিহার্য অঙ্গ ছিল যাগ-যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান। যাগ-যজ্ঞাদি সুসম্পন্ন করার জন্য নানা ধরনের বেদী নির্মাণ প্রয়োজন। বেদী নির্মাণে কোন রকম ভুলচুক হওয়া বা ত্রুটি হওয়া চলত না। ত্রুটিযুক্ত বেদীতে অনুষ্ঠান করলে কোন শুভ ফল পাওয়া যেত না, বরং অশুভ ফল হতো। তাই বেদী নির্মাণে বিশেষ সতর্ক থাকতে হতো, এবং শাস্ত্রের বিধি-নিয়ম কঠোরভাবে মেনে চলতে হতো। এখন, কোন সম্পাদ্য সমাধান করতে গেলে এরকম সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। একটি ত্রিভুজের অন্তঃবৃত্ত অঙ্কন করতে গেলে কীরূপ সতর্ক হতে হয়, তা প্রায় সবার জানা। যাই হোক, এইভাবে বেদী নির্মাণ থেকেই ভারতে জ্যামিতির উদ্ভব।

জ্যামিতিতে বিভিন্ন আকার-প্রকারের ভিন্ন ভিন্ন নাম। বেদীও ছিল তেমনি। বিভিন্ন আকার-প্রকার বিশিষ্ট বেদীর নামও ছিল আলাদা আলাদা। 'গার্হপত্য বেদী' ছিল বর্গাকার বা বৃত্তাকার, 'আহ্বনীয় বেদী' ছিল বর্গাকার, আর 'দক্ষিণ বেদী' দেখতে ছিল অর্ধবৃত্তাকার। তিন রকমের এই বেদীর আকারে পার্থক্য ছিল বটে, কিন্তু আয়তনে প্রভেদ ছিল না। অর্থাৎ সবার আয়তন ছিল সমান।

জটিল ধরনের আরো অনেক রকমের বেদী ছিল। সেগুলি আঁকতে গেলে যে ভীষণ জটিলতার সম্মুখীন হতে হয়, তা তাদের নাম ও বর্ণনা পড়লে অন্তত কিছুটা বোঝা যায়। 'শ্যেন-চিতি' ছিল ঈগল পাখীর মত দেখতে, 'কঙ্ক বেদী' বকের মত দেখতে, 'প্রউগ'-এর আকার ছিল সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ, 'উভয়ত প্রউগ' রম্বস ছাড়া আর কিছু নয়: এমন কি 'কূর্ম' নামে এক ধরনের বেদী ছিল। 'কূর্ম' নাম থেকেই

বোঝা যাচ্ছে এই বেদী দেখতে ছিল কচ্ছপের মত। ট্রাপিজিয়ামের মত দেখতে যে-বেদী ছিল তার নাম ছিল 'মহাবেদী'। এ ছাড়া আরো বহু ধরনের বেদীর নাম শুল্বশাস্ত্রে পাওয়া যায়।

জ্যামিতিকার পরিচয়

আগেই বলেছি, অতীত ভারতে গণিতাচার্যরা ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে ছিলেন সম্পূর্ণ নীরব। তাই তাঁদের নামটুকু ছাড়া প্রায় কোন পরিচয় পাওয়া যায় না।

প্রাচীন ভারতের জ্যামিতির নাম 'শুল্বশাস্ত্র' বা 'শুল্বসূত্র'। 'সূত্র' কথা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, নিয়মগুলি খুব সংক্ষিপ্ত আকারে লেখা হয়েছে। এখন জ্যামিতিতে যেমন প্রমাণের জন্য যুক্তির অবতারনা করা হয়, শুল্বসূত্রে তেমন কিছু নেই। যাই হোক, প্রাচীন যে-সব শুল্বকারদের নাম পাওয়া যায়, তাঁরা হলেন বোধায়ন, কাত্যায়ন, মানব, মৈত্রায়ণ, বারাহ ও বাধূল। তবে প্রথম তিনজনই প্রধান।

বোধায়ন

আচার্য বোধায়ন সবচেয়ে প্রাচীন শুল্যকার বা জ্যামিতি লেখক। কবে ইনি গ্রন্থ রচনা করেন সঠিকভাবে বলা না গেলেও খ্রীস্টপূর্ব 800 সালে তাঁর শুল্বসূত্র গ্রন্থটি রচিত হয়ে থাকবে বলে অনুমান করা হয়। আচার্য বোধায়নের লেখা বইটি সবচেয়ে বড়। বইটি তিনটি অধ্যায়ে বিভক্ত। এতে মোট 525টি সূত্র আছে। ইউক্লিডের জ্যামিতিতে মোট 467টি উপপাদ্য রয়েছে। এই সংখ্যা দিয়ে তুলনা করলে বোঝা যায়, প্রাচীন ভারতে জ্যামিতির অনুশীলন কত ব্যাপক ছিল।

বোধায়নের গ্রন্থে নানা ধরনের বেদী অর্থাৎ জ্যামিতির ছবি আঁকার নিয়ম কখনো বিস্তারিতভাবে, কখনো আবার অতি সংক্ষেপে বলা হয়েছে। অনেকের জানা, ইউক্লিড গণিতের অধ্যাপক ছিলেন। তেমনি বোধায়নও সম্ভবত কোন বৈদিক প্রতিষ্ঠানের আচার্য ছিলেন।

কাত্যায়ন

আচার্য কাত্যায়নের জ্যামিতি বইটির দুটি অংশ। প্রথম অংশ গদ্যে লিখিত, সূত্রসংখ্যা 90 এবং দ্বিতীয় অংশ পদ্যে লেখা। এতে সূত্রসংখ্যা প্রথম অংশের অর্ধেকেরও কম,—মাত্র 40 থেকে 48।

মহর্ষি কাত্যায়নের গ্রন্থের তেমন মূল্য নেই। এখানে বৌধায়নের গ্রন্থের নিয়মগুলিই আছে, কেবলমাত্র এখানে ওখানে ভাষার পরিবর্তন ঘটিয়ে। মনে হয়, তিনি তাঁর আগের আচার্যদের অনুসরণ করেছেন মাত্র, নিজে কোন নিয়ম বা সূত্র আবিষ্কার করেননি। তাঁর গ্রন্থ রচনার কাল আনুমানিক 500 খ্রীস্টপূর্বাব্দ।

আপস্তম্ব

বৌধায়নের তুলনায় কাত্যায়নের গ্রন্থের তেমন মূল্য ও বৈশিষ্ট্য না থাকলেও আপস্তম্বের গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য আছে। আচার্য বৌধায়ন যে নানা ধরনের বেদীর কথা বলেছেন, সেই বেদী তৈরী করার পদ্ধতি বর্ণনা করেননি তিনি। কিন্তু আপস্তম্ব সংক্ষেপে হলেও অনেক রকমের বেদী নির্মাণের পদ্ধতি বর্ণনা করে পূর্বাচার্যের ত্রুটি সংশোধন করেছেন। আপস্তম্বের শুল্বসূত্র গ্রন্থটি পড়লে নানা ধরনের জ্যামিতিক ছবি আঁকা সম্ভব। ইনি খুব সম্ভব 400 খ্রীস্টপূর্বাব্দে বর্তমান ছিলেন।

মানব

বাইরের দিক থেকে বিচার করলে কাত্যায়নের গ্রন্থের সঙ্গে মানবের গ্রন্থের মিল দেখতে পাওয়া যায়। দু-জনের গ্রন্থেই পদ্যের ব্যবহার রয়েছে। তা ছাড়া আরো কিছু মিল বা সাদৃশ্য দেখা যায়। কিন্তু মানবের গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য রয়েছে যে, বৌধায়ন ও আপস্তম্ব যে-সব বেদীর নাম পর্যন্ত উল্লেখ করেননি, তার উল্লেখ এখানে রয়েছে। মনে হয়, মানবের গ্রন্থটি ভারতের কোন বিশেষ অঞ্চলে প্রচলিত ছিল।

মানব বেদী নির্মাণের জন্য দড়ির বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন, এবং শঙ্কু কেমন হবে তাও বলে গেছেন। তা ছাড়া আর একটি গুরুত্বপূর্ণ

ও অত্যাবশ্যকীয় বিষয়ের বর্ণনা তিনি করেছেন। তিনি **'পূর্ব-পশ্চিম রেখা'** নির্ণয়ের বর্ণনাও করেছেন। কারণ, এই রেখা না জানলে কোন বেদী নির্মাণই সম্ভব নয়। অথচ বৌধায়ন, আপস্তম্ব প্রমুখ আচার্যরা এ-বিষয়ে সম্পূর্ণ নীরব।

মৈত্রায়ন, বারাহ ও বাধূলের গ্রন্থগুলির কোন বৈশিষ্ট্য নেই। মানব রচিত গ্রন্থের সহিত তাঁদের গ্রন্থের অনেক মিল দেখা যায়।

কয়েকটি সম্পাদ্য ও উপপাদ্য

আগেই বলেছি, বৈদিক অনুষ্ঠানের অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গ হচ্ছে যাগ-যজ্ঞ। যাগ-যজ্ঞ করতে গেলেই বেদী নির্মাণ করতে হয়। যে বিভিন্ন প্রকার বেদীর উল্লেখ করেছি তা সুষ্ঠুভাবে করতে গেলে বর্গ, আয়তক্ষেত্র, রম্বস, ট্রাপিজিয়াম, ত্রিভুজ ও বৃত্ত ইত্যাদির ধর্ম সম্পর্কে ভাল জ্ঞান থাকা চাই। বেদী নির্মাণে যে সব বিষয়ে জ্ঞান থাকা চাই, তাকেই আমরা সম্পাদ্য বলছি। এখানে তার কয়েকটি উল্লেখ করা হলো :

সম্পাদ্য

1) যে-কোন সরলরেখাকে যে কোন সংখ্যক সমান অংশে বিভক্ত কর।

2) ব্যাস অঙ্কনের দ্বারা বৃত্তকে যে কোন সংখ্যক সমান অংশে বিভক্ত কর।

3) একটি ত্রিভুজকে যে কোন সংখ্যক সমান ও সদৃশ ক্ষেত্রে বিভক্ত কর।

4) প্রদত্ত সরলরেখার ওপর সমকোণে একটি সরলরেখা অঙ্কন কর।

5) প্রদত্ত বাহু দ্বারা একটি বর্গক্ষেত্র অঙ্কন কর।

6) প্রদত্ত বাহুদ্বয় ও কোণের সাহায্যে একটি সামন্তরিক অঙ্কন কর।

7) প্রদত্ত দুইটি ত্রিভুজের সমান একটি বর্গক্ষেত্র অঙ্কন কর।

উপপাদ্য

শুল্বসূত্রে উপপাদ্যগুলি ইউক্লিডের মত বিবৃত হয়নি,—গ্রন্থের মধ্যে কোথাও বিবৃত হয়েছে, আবার কোথাও ফলের তাৎপর্য থেকে বুঝতে পারা যায়। এখানে কয়েকটির উল্লেখ করা হলো :

1) আয়তক্ষেত্রের কর্ণদ্বয় পরস্পরকে সমদ্বিখণ্ডিত করে।

2) রম্বসের কর্ণদ্বয় পরস্পরকে সমকোণে সমদ্বিখণ্ডিত করে।

3) শীর্ষবিন্দু ও ভূমির মধ্যবিন্দুর সংযোজন সরলরেখা সমদ্বিবাহু ত্রিভুজকে দুটি সমান অংশে বিভক্ত করে।

4) একই ভূমি ও সমান্তরাল যুগলের মধ্যে অবস্থিত সামন্তরিক ও আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল সমান।

5) সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজের ওপর অঙ্কিত বর্গ অপর দুই বাহুর ওপর অঙ্কিত বর্গের সমষ্টির সমান।

6) কোন ত্রিভুজের দুইটি বাহুর ওপর অঙ্কিত বর্গের সমষ্টি তৃতীয় বাহুর ওপর অঙ্কিত বর্গের সমান হলে, ত্রিভুজটি সমকোণী হবে।

ভারতীয় জ্যামিতি ও পীথাগোরাস

পীথাগোরাসের নাম শোনেনি এমন কেউ নেই। বিশেষত তাঁর উপপাদ্যটির কথা প্রায় সর্বজনবিদিত। গণিতে এই উপপাদ্যটি নানা দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। আবিষ্কারক হিসাবে পীথাগোরাসের নাম বহুদিন থেকে চলে আসছে। কিন্তু পীথাগোরাসের অনেক আগে এই উপপাদ্যটি আমাদের দেশের গণিতাচার্যরা আবিষ্কার করেছিলেন। কিন্তু কে, কবে এবং কোথায় আবিষ্কার করেছিলেন, তা আজ আর বলা সম্ভব নয়।

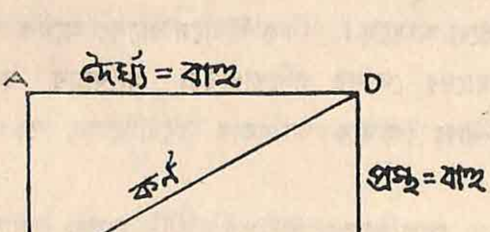
পীথাগোরাস জন্মেছিলেন খ্রীস্টপূর্ব 500 সালে, আর বৌধায়ন বর্তমান ছিলেন খ্রীস্টপূর্ব 800 সালে। তা হলে দেখা যাচ্ছে, উপপাদ্যটি যদি খুব প্রাচীনকালে আবিষ্কৃত নাও হয়, তা হলেও অন্তত পীথাগোরাসের 300-400 বছর আগে এদেশের গণিতজ্ঞদের অপরিচিত ছিল না। কিন্তু একটি কথা আমাদের বিবেচনা করে দেখা দরকার

যে, শুল্বসূত্র গ্রন্থের রচয়িতারা কেউ কোন নিয়ম-সূত্র আবিষ্কার করেননি ; তাঁরা কেবলমাত্র শাস্ত্রীয় নিয়ম রচনা করেছিলেন মাত্র। সুতরাং বৌধায়ন বা অন্য কোন শুল্বসূত্রকার এই সূত্রের আবিষ্কারক নন, তাঁর পূর্ববর্তী কোন ঋষি-গণিতজ্ঞ। তা ছাড়া আর একটি বিষয় ভেবে দেখতে হয় যে, পীথাগোরাসের সহিত ভারতীয় দর্শনের পরিচয় ছিল। অন্তত তাঁর দার্শনিক চিন্তার মধ্যে ভারতীয় দর্শনের সাদৃশ্য দেখা যায়। সুতরাং যদি তিনি পশ্চিম এশিয়ার মধ্য দিয়ে ভারতীয় দর্শনের সহিত পরিচিত হয়ে থাকেন, তা হলে তাঁর নামাঙ্কিত উপপাদ্যটির পরিচয় তিনি ভারতীয় সভ্যতার মাধ্যমে পেয়েছিলেন, এমন অনুমান নিছক কল্পনা নয়।

যাই হোক, আচার্য বৌধায়নের শুল্বসূত্র গ্রন্থে এই উপপাদ্যটির বর্ণনা পাওয়া যায়। এখন জ্যামিতি বই-এ উপপাদ্যটি যে ভাষায় বিবৃত আছে, শুল্বসূত্রে তেমন ভাষায় নেই। সেখানে উপপাদ্যটি এভাবে বিবৃত হয়েছে :

"আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ যাহা (ক্ষেত্রফল) পৃথক পৃথকভাবে উৎপন্ন করে তাহা (ক্ষেত্রফল) উহার কর্ণ উৎপন্ন করে।"

আরো সহজ ও সরল করে বললে, আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের ক্ষেত্রফলের সমষ্টি কর্ণের ক্ষেত্রফলের সমান।



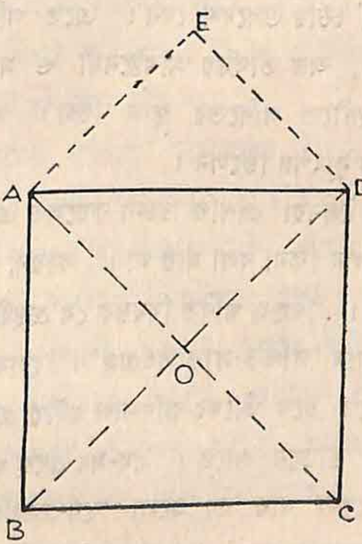
চিত্র 3-এ ABCD একটি আয়তক্ষেত্র ; কর্ণ BD আয়তক্ষেত্রকে

দুটি সমকোণী ত্রিভুজে বিভক্ত করেছে। দৈর্ঘ্য BC = বাহু ও প্রস্থ CD = বাহু, এবং কর্ণ BD = অতিভুজ। বোধায়ণের বিবৃতির আধুনিক রূপ :

$$BD^2 = BC^2 + CD^2$$

বিশেষ ক্ষেত্রে এই উপপাদ্যটিকেই আবার অন্য ভাষায় প্রকাশ করা যায়। **'বর্গক্ষেত্রের কর্ণ তার দ্বিগুণ ক্ষেত্র উৎপন্ন করে।'**

শুল্বসূত্রে বর্ণিত এই উপপাদ্যটি অনেক জায়গায় বর্গক্ষেত্রের দ্বিগুণী-করণে ব্যবহৃত হয়েছে। তৈত্তরীয় সংহিতা ও অন্যান্য সংহিতাতেও এর উল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই বিবৃতি বা স্বীকার্যের প্রমাণ দেখা যায় না কোথাও। কিন্তু প্রাচীন গণিতাচার্যরা এটা জানতেন যে, বর্গক্ষেত্রের কর্ণদ্বয় যে চারটি ত্রিভুজ উৎপন্ন করে তাদের একটি ক্ষেত্রফল প্রথম বর্গের ক্ষেত্রফলের অর্ধেক। নীচের চিত্রটি দেখলে আরো স্পষ্ট হবে :



প্রকৃতপক্ষে, ভারতীয় জ্যামিতি ও গণিতের পরিভাষা আধুনিক পাঠকের বোঝা অসুবিধাজনক। কিন্তু বিষয়বস্তুর গুরুত্ব মর্যাদা ও

সম্ভ্রমের। এখানে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করে প্রাচীন ভারতীয় জ্যামিতির সামান্য পরিচয় দেওয়া হলো। বিস্তারিত বিবরণ লেখকের 'প্রাচীন ভারতীয় গণিতের ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে পাওয়া যেতে পারে বা যে-কোন ভারতীয় গণিতের ইতিহাসে লভ্য।

জৈনদের গণিত প্রীতি

জৈনধর্মের কথা আমরা অনেকেই শুনেছি ও কিছু কিছু পড়েছি। শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীরের নাম শিশু পর্যন্ত জানে। কিন্তু জৈন-ধর্মাবলম্বীদের গণিতপ্রীতির কথা অনেকের অজানা। সত্যি কথা বলতে, ধর্মচর্চার অন্যতম অঙ্গ হিসাবে জৈনদের কাছে গণিতের বিরাট আকর্ষণ ছিল। তাই তাঁদের ধর্মীয় গ্রন্থরাজির মধ্যেও গাণিতিক তথ্য পাওয়া যায়।

জৈনধর্মের প্রথম তীর্থঙ্করের নাম ঋষভদেব। প্রকৃত শিক্ষার জন্য তিনি 'বাহাত্তর কলা' চর্চার উপদেশ দেন। এতে গণিতের স্থান ছিল বিশেষভাবে নির্দিষ্ট। অন্য তীর্থঙ্কর অরিষ্টনেমী ও মহাবীর বর্ধমানের বাল্যকালে শিক্ষা-সূচীতে গণিতের স্থান ছিল। তা ছাড়া মহাবীর বর্ধমান নাকি গণিতে ব্যুৎপন্ন ছিলেন।

গণিত বিষয়ে জৈনরা প্রশস্তি রচনা করলেও এ-বিষয়ে বেশী গ্রন্থ তাঁরা রচনা করেছিলেন কিনা বলা যায় না। কারণ, এখন আর বেশী গ্রন্থ পাওয়া যায় না। বিশুদ্ধ গণিত বিষয়ক যে গ্রন্থটি জৈন গণিতাচার্য কর্তৃক রচিত, তার নাম '**গণিত-সার-সংগ্রহ**'। লেখক মহাবীরাচার্য। কিন্তু স্বীকার করতে হবে তাঁদের সুবিশাল ধর্মীয় গ্রন্থরাজির মধ্যে বহু গাণিতিক উপাদান ছড়িয়ে আছে। যে-সব গ্রন্থে গাণিতিক উপাদান অধিক পরিমাণে দেখা যায় তা হলো 'সূর্য-প্রজ্ঞপ্তি,' 'চন্দ্র-প্রজ্ঞপ্তি,' 'জম্বুদ্বীপ-প্রজ্ঞপ্তি,' 'স্থানাঙ্গ সূত্র,' 'সমবায়াঙ্গ,' 'গণিত-বিদ্যা' ইত্যাদি। স্থানাঙ্গ সূত্রে 1 থেকে 10 পর্যন্ত সংখ্যার নানা তথ্য আলোচিত হয়েছে ; সমবায়াঙ্গে স্থানাঙ্গ সূত্রের বিস্তারিত আলোচনা দেখা যায়। 'কল্পসূত্র'

ও 'উত্তরাধ্যয়ন সূত্র' গণিত সম্পর্কিত বই নয় বটে, কিন্তু এখানেও গাণিতিক উপাদান দুর্লভ নয়।

শেষের বই দুটির রচয়িতা ভদ্রবাহু। তিনি গণিতজ্ঞ বা জ্যোতির্বিদ ছিলেন কিনা সঠিকভাবে বলা যায় না। কিন্তু তিনি যে বিস্ময়কর ধীশক্তির অধিকারী ছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই। তবে তাঁর গণিতে আগ্রহ ও আকর্ষণ ছিল, এবং গণিতে প্রাথমিক জ্ঞানের অভাব ছিলনা, —এমন প্রমাণ আছে।

ভদ্রবাহু

এক সময় বেদ মুখস্থ ছিল। শেখানোও হতো মুখে। এখনো 'কোরাণ' অনেকে মুখস্থ করে। ভদ্রবাহুর সমগ্র জৈনশাস্ত্র কণ্ঠস্থ ছিল। সেইজন্য তাঁকে 'শ্রুতকেবলিন' বলা হয়।

ভদ্রবাহু ছিলেন মগধের অধিবাসী। গৃহী ছিলেন না, ছিলেন সন্ন্যাসী। সংসারবিরাগী মানুষের পার্থিব জীবনের প্রতি যে কোন আকর্ষণ থাকবে না, তাতে আর সন্দেহ কি! সেইজন্য তাঁর ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে প্রায় কিছুই জানা যায় না।

কীর্তিমান মানুষদের সম্পর্কে অল্পকালের মধ্যেই নানা কিংবদন্তী গড়ে ওঠে। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক, কবি, দার্শনিক ইত্যাদির জীবনে কিংবদন্তীর অভাব নেই, গল্পের অভাব নেই। ভদ্রবাহু সম্বন্ধেও একটি কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের রাজত্বকালে বারো বছরব্যাপী একবার ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। ভদ্রবাহু ছিলেন ত্রিকালজ্ঞ জ্যোতিষী। জ্যোতিষ গণনা করে তিনি আগেই জানতে পারলেন দুর্ভিক্ষের কথা। সেইজন্য বহুশিষ্য সঙ্গে নিয়ে তিনি দক্ষিণভারতের কন্নড় দেশে চলে গেলেন। আর সেখানেই আশ্রম স্থাপন করে রয়ে গেলেন।

ভদ্রবাহু দক্ষিণ ভারতে গেলেন বটে, কিন্তু আরো বহু শিষ্য তাঁর সঙ্গী হলেন না। তাঁরা মগধেই থেকে গেলেন। কিন্তু ঠিক সময়ে

ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। মগধের শিষ্যরা সেই প্রাকৃতিক দুর্ঘটনার সম্মুখীন হলেন। কিন্তু দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে তাঁরা ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান বজায় রাখতে পারলেন না। এই সময় থেকেই জৈনদের মধ্যে শ্বেতবস্ত্র পরিধান শুরু হয়। যাঁরা উত্তর ভারতে ছিলেন তাঁরা শ্বেতবস্ত্র পরলেন, আর দক্ষিণ ভারতে ভদ্রবাহু ও তাঁর শিষ্যগণ বস্ত্র পরিধান করলেন না। এইভাবে জৈনধর্ম দুটি শাখায় বিভক্ত হলো : দিগম্বর ও শ্বেতাম্বর। বলা বাহুল্য, ভদ্রবাহু ছিলেন দিগম্বর সম্প্রদায়ভুক্ত।

সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত নাকি ভদ্রবাহুর শিষ্য ছিলেন। শেষ বয়সে চন্দ্রগুপ্ত দক্ষিণ ভারতের শ্রাবণ বেলগোলা পর্বতে অনশনে দেহত্যাগ করেন। এখনো এই পর্বতে অসংখ্য জৈনমন্দির দেখতে পাওয়া যায়।

ভদ্রবাহুর মৃত্যু তারিখ নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। তবে জানা যায় যে, মহাবীর বর্ধমানের মৃত্যুর 170 বছর পরে তাঁর মৃত্যু হয়। সাধারণত মহাবীরের মৃত্যু তারিখ 527 খ্রীস্টপূর্বাব্দ ধরা হয়।

ভদ্রবাহু দুইটি জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের রচয়িতা বলে অনুমান করা হয়। একটি 'সূর্য-প্রজ্ঞপ্তি' গ্রন্থের ভাষ্য, আর অপরটির নাম 'ভদ্রবাহবী সংহিতা'। কিন্তু দুটি বই-এর কোনটিই আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। তবে প্রথমটির অস্তিত্ব অন্ততপক্ষে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বর্তমান ছিল। 'ভদ্রবাহনী সংহিতা' নামে একটি গ্রন্থের উল্লেখ জার্মান পণ্ডিত ব্যুহলার করেছেন। কিন্তু এটি ভদ্রবাহুর রচনা কিনা সন্দেহ করা হয়। যাই হোক, ভদ্রবাহুর গণিত-জ্ঞান ছিল, তাতে সন্দেহ নেই। তাঁর 'উত্তরাধ্যয়ন সূত্র' গ্রন্থে গোলকের অংশের বর্ণনা এরূপ : "ইহা পঁয়তাল্লিশ শত হাজার যোজন দৈর্ঘ্য, বিস্তারেও তাই, এবং পরিধির চেয়ে ইহা প্রায় তিনগুণেরও অধিক!" প্রাচীন ভারতীয় গণিতে পাই (π)-এর দু-রকম মান পাওয়া যায়। একটি স্থূল মান, অপরটি সূক্ষ্ম মান। উত্তরাধ্যয়ন সূত্রে ভদ্রবাহু স্থূল মানের উল্লেখ করেছেন।

উমাস্বাতী

ভারতের কোন কোন অঞ্চলে এখনো ব্যক্তির নামের সঙ্গে পিতা

বা মাতার নাম জড়িয়ে থাকে। দক্ষিণ ভারতে এরকম নামকরণ দেখা যায়। উমাস্বাতী নামের সঙ্গেও তেমনি পিতামাতার নাম জড়িয়ে আছে বলে অনুমান করা হয়। এরূপ মনে করা হয়, তাঁর পিতার নাম স্বাতী ও মাতার নাম উমা।

উমাস্বাতী 150 খ্রীস্টপূর্বাব্দে ন্যগ্রোধিকায় জন্মগ্রহণ করেন। এই জায়গাটি বিখ্যাত কুসুমপুরের অন্তর্গত। কুসুমপুর ছিল বর্তমান পাটনা শহরের কাছে। ভারতের গণিতের ইতিহাসে কুসুমপুর নামটি স্মরণীয়। এখানে আচার্য আর্যভট জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর কথা পরে আলোচনা করব।

ভদ্রবাহুর মত উমাস্বাতীও গণিতজ্ঞ ছিলেন কিনা বলা যায় না। কিন্তু তাঁর রচিত গ্রন্থে প্রচুর গাণিতিক উপাদান ছড়িয়ে রয়েছে। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থটির নাম 'তত্ত্বার্থাধিগম-সূত্র'। এই গ্রন্থে অন্য গণিত গ্রন্থের উদ্ধৃতি দেখতে পাওয়া যায়। তা থেকে মনে হয়, উমাস্বাতী গণিতজ্ঞ না হলেও গণিত বুঝতেন, এবং এই বিষয়ে তাঁর জ্ঞান খারাপ ছিল না।

তত্ত্বার্থাধিগম-সূত্রে কয়েকটি সূত্র

আমরা আগেই বলেছি, 'তত্ত্বার্থাধিগম-'সূত্র' গ্রন্থের গাণিতিক উপাদান বা সূত্র-নিয়ম প্রকৃতপক্ষে উমাস্বাতীর আবিষ্কার কিনা বলা যায় না। তবে গ্রন্থটির প্রকৃতি বিবেচনা করলে এই সিদ্ধান্ত করতে হয় যে, এ-সব সূত্র-নিয়ম তিনি হয়তো তাঁর সময়ে প্রচলিত গ্রন্থাদি থেকে গ্রহণ করেছেন। এখানে কয়েকটি সূত্র আধুনিক গাণিতিক ভাষায় প্রকাশ করে উল্লেখ করা হলো :

যদি C কোন বৃত্তের পরিধি, d ব্যাস ও A ক্ষেত্রফল হয়, তা হলে—

(1) $C = \sqrt{10d^2}$

(2) $A = \frac{1}{4}cd$

আবার, যদি a অর্ধবৃত্তাংশ অপেক্ষা কম বৃত্তাংশস্থিত চাপ হয়, এবং c জ্যা ও h উচ্চত হয়, তা হলে

(3) $c = \sqrt{4h(d-h)}$

(4) $h = \frac{1}{2}(d - \sqrt{d^2 - c^2})$

(5) $a = \sqrt{6h^2 + c^2}$

(6) $d = \left(h^2 + \frac{c^2}{4} \right) \Big| h$

তত্ত্বার্থাধিগম-সূত্রে গুণ ও ভাগের দুটি পদ্ধতির উল্লেখ দেখা যায়। একটি সাধারণ পদ্ধতি যাতে দুটি সংখ্যা সামগ্রিকভাবে বিবেচনা করে প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হয়। অপরটিতে গুণনীয়কের সাহায্যে পর পর প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হয়। গুণন ক্রিয়ায় গুণনীয়কের ব্যবহারের কথা প্রায় সব গণিতজ্ঞই ব্রহ্মগুপ্তের পর থেকে উল্লেখ করেছেন। ভাগ ক্রিয়ায় গুণনীয়কের ব্যবহারের কথা শ্রীধরাচার্য তাঁর 'ত্রিশতিকা'-য় উল্লেখ করেছেন। এই পদ্ধতি মধ্যযুগে ইউরোপে প্রচারিত হয় আরব গণিতজ্ঞদের মধ্য দিয়ে। অথচ ভারতে খ্রীষ্টপূর্ব 200 কি তার বহু আগে এই পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছিল। এটা আমাদের পক্ষে কম গৌরবের নয়।

প্রথম আর্যভট

1975 সালের 19শে এপ্রিল। সোভিয়েত উৎক্ষেপণ মঞ্চ থেকে একটি উপগ্রহ মহাকাশে পাড়ি দিল। এর নাম সবার জানা—আর্যভট। এটি ভারতের প্রথম উপগ্রহ। প্রথমে মনে করা হয়েছিল, এটি ছ'মাস কার্যকর থাকবে কিন্তু চালু ছিল তার চেয়েও বেশী সময়। ভারত মহাকাশে পদার্পণ করল প্রথম প্রয়াসেই। ভারতীয় মহাকাশ সংস্থা 'আর্যভট' নামকরণ করে প্রাচীন ভারতীয় গণিতাচার্যের প্রতি যে সম্মান দেখালেন, তাতে দেশবাসী যেমন আনন্দিত, তেমনি গর্বিত। বলা যায়, তখন থেকেই সাধারণ মানুষের কাছে আর্যভট নামটি পরিচিত

হয়ে উঠল। আর্যভট প্রাচীন ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিদ।

আর্যভট না আর্যভট্ট

অনেক পত্র-পত্রিকায় 'আর্যভট' ও 'আর্যভট্ট' এই দুটি নাম দেখা যায়। এরূপ মনে হতে পারে কোনটি ঠিক,—'আর্যভট' না 'আর্যভট্ট'? সত্যিকথা বলতে কি, আর্যভট বলাই যুক্তিসঙ্গত, আর্যভট্ট বলা উচিত নয়। তবে অনেকে 'ভট্ট' উচ্চারণ করেন এইজন্য যে, নামের সঙ্গে 'ভট্ট' যুক্ত অনেক নাম পাওয়া যায়। যেমন, বাণভট্ট, ভবদেবভট্ট, কুমারিল ভট্ট, যদু ভট্ট ইত্যাদি। 'ভট্ট'-এর সঙ্গে অধিকতর পরিচয় থাকায় 'ভট' যেন আমাদের মনঃপূত নয়। 'ভট্ট' শব্দের প্রকৃত অর্থ ভট্ট ব্রাহ্মণ। অন্য ব্যক্তির যশোগান করাই এদের উপজীবিকা। চলতি কথায় এদের ভাট ব্রাহ্মণ বলা হয়। তা ছাড়া এদের জন্মের আভিজাত্য নেই বলে মনে করা হয়। সে যাই হোক, 'আর্যভট্ট' উচ্চারণ না করে 'আর্যভট' উচ্চারণ করাই যুক্তিসঙ্গত।

একই নামধারী বিভিন্ন ব্যক্তি থাকা বিচিত্র নয়। একই নাম ও পদবীধারী ব্যক্তির দৃষ্টান্ত ভুরি ভুরি আছে। প্রাচীন ভারতে আর্যভট নামে একাধিক গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিদ ছিলেন। দু-জন আর্যভট তো আছেনই, এমন কি তিনজন থাকাও বিচিত্র নয়। তাঁদের মধ্যে আমাদের আলোচ্য আর্যভট আগে জন্মেছিলেন বলে তাঁকে **প্রথম আর্যভট** বলা হয়। আর একজন আর্যভটের কথা আমরা পরে আলোচনা করব যিনি দ্বিতীয় আর্যভট নামে পরিচিত। আর তৃতীয় আর্যভট প্রথম আর্যভটের পূর্ববর্তী বা পরবর্তী যাই হোন, তাঁর লেখা কোন গ্রন্থ আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি।

দেশ কাল ও জন্ম

গুপ্তযুগ ভারতের ইতিহাসে স্বর্ণযুগ। এই সময় দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ভাল ছিল, শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় ছিল এবং রাজারাও ছিলেন

সুশাসক। মোট কথা, তখন জ্ঞান-বিজ্ঞানচর্চার অনুকূল পরিবেশ ছিল। তাই কাব্য-সাহিত্য, জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা ক্ষেত্রে তখন প্রতিভাবান ব্যক্তিদের আবির্ভাব হয়। এই রকম অনুকূল পরিবেশে আর্যভট বিহারের অন্তর্গত কুসুমপুরে—ইতিহাসে যার নাম পাটলিপুত্র আর এখন আমরা যাকে পাটনা বলে জানি, তার কাছে 476 খ্রীস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।

অতি অল্প বয়সেই আর্যভটের প্রতিভা বিকশিত হয়ে পরিপূর্ণতা লাভ করে। মাত্র তেইশ বছর বয়সে তিনি একটি অসামান্য গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থটির নাম **আর্যভটীয়**। অপর একটি গ্রন্থ তিনি লিখে থাকবেন বলে অনুমান করা হয়। কিন্তু সেটি আজও পাওয়া যায়নি।

আর্যভটীয়

আর্যভটীয়-তে মোট একশ' একুশটি শ্লোক রয়েছে। ব্রহ্মগুপ্ত ও ভাস্করাচার্যের গ্রন্থের তুলনায় এটি ক্ষুদ্র গ্রন্থ। এর চারটি অংশ : গীতিকাপাদ, গণিতপাদ, কালক্রিয়াপাদ ও গোলপাদ। গীতিকাপাদে বর্ণমালার সাহায্যে সংখ্যা প্রকাশের এক অভিনব পদ্ধতির কথা বলেছেন ; কালক্রিয়া ও গোলপাদ অধ্যায় দুটি জ্যোতিবিজ্ঞান সংক্রান্ত। এখানে জ্যোতির্বিজ্ঞানের নীতি ও গণনার সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করেছেন। প্রাচীন গণিতাচার্যরা গণিত নিয়ে পৃথক কোন গ্রন্থ রচনা করেননি। জ্যোতির্বিজ্ঞানের আলোচনা প্রসঙ্গে গণিত সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক আলোচনা দেখা যায়। আর্যভট 121টি শ্লোকের মধ্যে মাত্র 33টি শ্লোকে গণিতের আলোচনা করেছেন, তাও আবার সূত্রাকারে।

প্রায় দেড় হাজার বছর আগে জন্মেছিলেন আচার্য আর্যভট। গণিতের কি কি বিষয় নিয়ে তিনি আলোচনা করেছিলেন, তা জেনে নিলে তাঁর সময়ের ও তাঁর আগে ভারতে গণিতে কি রকম উন্নতি হয়েছিল জানতে পারা যায়। আর্যভটীয় গ্রন্থে বর্গ, বর্গমূল, ঘন,

ঘনমূল, ত্রিভুজ, ট্রাপিজিয়াম ইত্যাদির ক্ষেত্রফল, বৃত্ত, পিরামিডের আয়তন, সমান্তর শ্রেণী ও শ্রেণীর সমষ্টি নির্ণয়, সুদকষা, ত্রৈরাশিক, ভগ্নাংশ, ত্রিকোণামিতির সাইন তালিকা প্রস্তুতি, দ্বিঘাত সমীকরণ, একঘাত অনির্ণেয় সমীকরণ ইত্যাদি আলোচিত হয়েছে। কিন্তু সবই সূত্রের আকারে, বিস্তারিত আলোচনা বা ব্যাখ্যা কোথাও নেই।

আর্যভটীয় গ্রন্থে আলোচিত যে-সব গাণিতিক বিষয়ের উল্লেখ করা হলো, তা একেবারে নতুন নয়। এই ঐতিহ্য প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে। তবে আচার্য আর্যভট হয়তো কোন কোন পদ্ধতির উন্নতি ও সংস্কার করে থাকবেন। কিন্তু কয়েকটি ক্ষেত্রে তাঁর কৃতিত্ব উল্লেখের দাবী রাখে। যেমন,—পাই (π)-এর মান নির্ণয়, বর্ণমালার সাহায্যে সংখ্যা প্রকাশের এক অভিনব পদ্ধতি, সাইন তালিকা প্রস্তুতি এবং একঘাত অনির্ণেয় সমীকরণের সমাধান পদ্ধতি।

দু-একটি উজ্জ্বল কৃতিত্ব

স্কুলের নীচের ক্লাস থেকেই বর্গমূল নির্ণয় করতে শিখতে হয়। ষষ্ঠ শ্রেণীতে সাধারণত উৎপাদক বিশ্লেষণ করে বর্গমূল নির্ণয় করার পদ্ধতি শেখানো হয়। কিন্তু সপ্তম শ্রেণীতে ভাগ পদ্ধতিতে শেখানো হয়। এই পদ্ধতিটি সাধারণ বটে, কিন্তু বৃহৎ বর্গসংখ্যার বর্গমূল করতে গেলে বেশ অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। তা হলেও শিক্ষার্থী এই পদ্ধতি অবলম্বন করতে বাধ্য হয়। শিক্ষার্থী কেন, সাধারণ শিক্ষিত মানুষ সবাই এই পদ্ধতিটি জানেন। অবশ্য অভ্যাসের ফলে হয়তো এই পদ্ধতির জটিলতা তেমন বোঝা যায় না। কিন্তু শিক্ষার্থীদের সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে তাঁরা জানেন, এই পদ্ধতি সব শিক্ষার্থীর পক্ষে সহজ ও সরল নয়। আচার্য আর্যভট বর্গমূল নির্ণয়ের একটি সহজ ও সরল পদ্ধতির কথা তাঁর আর্যভটীয়-তে বলেছেন। মনে হয়, এর চেয়ে কোন সহজ পদ্ধতি নেই। কারণ, এতে সাধারণ ভাগের নিয়ম অবলম্বন করলেই বর্গমূল নির্ণীত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, গ্রীক পদ্ধতি খুবই জটিল।

প্রচলিত পদ্ধতিতে যেমন প্রদত্ত সংখ্যার ডানদিক থেকে জোড়া করতে হয়, আর্যভটীয় পদ্ধতিতে তার কোন প্রয়োজন নেই। পরিবর্তে ডানদিক থেকে প্রতিটি অঙ্কের ওপর প্রথমে উল্লম্বরেখা, পরে অনুভূমিক রেখা দিয়ে চিহ্নিত করতে হয়। উল্লম্বরেখা দ্বারা অযুগ্ম-স্থান ও অনুভূমিক রেখা দ্বারা যুগ্ম-স্থান বোঝায়। এবার আর্যভটের নিয়মটি বিবৃত করা যাক :

"যুগ্ম-স্থানে সর্বদা মূলের দ্বিগুণ দ্বারা ভাগ করতে হবে ; অযুগ্ম-স্থানে সর্বদা বিয়োগ করে ভাগফল পূর্ববর্তী মূলরেখায় বসিয়ে দিলেই বর্গমূল নির্ণীত হবে।"

উদাহরণ ছাড়া অঙ্কের নিয়ম সব সময় বোঝা যায় না। তাই একটি উদাহরণের সাহায্যে আর্যভটীয় পদ্ধতিতে বর্গমূল নির্ণয় করা যাক।

উদাহরণ : বর্গমূল নির্ণয় কর : 54756

1) নিকটতম বর্গ অঙ্কটি বিয়োগ	$\overset{\prime}{5}\ \bar{4}\ \overset{\prime}{7}\ \bar{5}\ \overset{\prime}{6}$ (মূল = 2
	4
2) মূলের দ্বিগুণ দ্বারা ভাগ $2 \times 2 = 4$	4) 14 (3 = মূলের পরবর্তী অঙ্ক
	12
3) ভাগফলের বর্গ বিয়োগ $3^2 = 9$	27
	9
4) মূলের দ্বিগুণ দ্বারা ভাগ $23 \times 2 = 46$	46) 185 (4 = মূলের পরবর্তী অঙ্ক
	184
5) ভাগফলের বর্গ বিয়োগ $4^2 = 16$	16
	16
	×

$\therefore$ নির্ণেয় বর্গমূল = 234

উদাহরণটিতে পাঁচটি সোপান আছে বটে, কিন্তু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে আসলে দুটি। প্রকৃতপক্ষে 1 নম্বর ও 2 নম্বর নিয়মই পর্যায়ক্রমে

এসেছে। বর্গমূল নির্ণয়ের এর চেয়ে সহজ ও সরল পদ্ধতি আর দেখা যায় না।

বর্ণমালার সাহায্যে সংখ্যা প্রকাশ

ছেলেবেলাকার শতকিয়া পড়ার কথা একবার ভাবা যাক। আমরা অনেকেই একে চন্দ্র, দুয়ে পক্ষ, তিনে নেত্র ইত্যাদি পড়েছি, তাই নয় কি? আচ্ছা, এমন ভাবে পড়ার কি কারণ থাকতে পারে একবারও কারুর মনে হয়েছে? একটু ভাবলেই কিন্তু রহস্যটা ধরা পড়ে যায়। চন্দ্র, পক্ষ, নেত্র ইত্যাদি এক একটি শব্দ বই-তো নয়। আর এক, দুই, তিন ইত্যাদি হচ্ছে সংখ্যা। এখানে শব্দ দিয়ে সংখ্যা প্রকাশ করা হচ্ছে। অর্থাৎ—চন্দ্র মানে এক, পক্ষ মানে দুই, নেত্র তিন ইত্যাদি। তেমনি—আচার্য আর্যভট বর্ণমালার বিভিন্ন বর্গ (ক, খ, গ—ইত্যাদি) দিয়ে সংখ্যা প্রকাশ করার এক নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। আচার্য-আর্যভটের অনুকরণে এরকম অনেক রকমের পদ্ধতি পরে আবিষ্কৃত হয় আমাদের দেশে। এমন কি, বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম অঙ্কের বই 'অঙ্কপুস্তকং'-এ এই ধরনের পদ্ধতির প্রচলন দেখা যায়।

এযুগে নাহলেও সেই প্রাচীন যুগে কিছু টেক্‌নিক্যাল অসুবিধার জন্য এই পদ্ধতির খুব দরকার ছিল। তখন ছাপাখানা ছিল না, পুঁথি পুস্তকও সুলভ ছিল না। কিন্তু বড় বড় সংখ্যা মনে রাখতে হতো। বিশেষত জ্যোতির্বিজ্ঞানে বড় বড় সংখ্যার ব্যবহার হয়। মনে রাখার সুবিধার জন্য এই পদ্ধতিতে বর্ণ দিয়ে শব্দ গঠন করে কেবল সেই শব্দটি মনে রাখলেই চলে। বৃহৎ বৃহৎ সংখ্যা গঠনের পরিকল্পনা আর্যভট উদ্ভাবন করবেন। তবে আর্যভট যে সব শব্দ গঠন করেন তা উচ্চারণ করা খুবই কঠিন। সেই জন্য পরবর্তী কালে অনেক সহজ পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়। আর্যভট কৃত দুটি বর্ণ-সংখ্যা।

i) 'ঘৃ' $=$ (ঘ $+$ ঋ) $= 4 \times 10^6$; ঘ $= 4$, ঋ $= 10^6$

ii) খ্যুঘৃ $= 2 \times 10^4 + 3 \times 10^5 + 4 \times 10^6 = 4{,}320{,}000$

পাই (π)-এর মান

অতি প্রাচীনকাল থেকেই সারাবিশ্বে পাই-সংখ্যাটির দেখা মেলে। গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞানে এর বহুল প্রয়োগ দেখা যায়। সঠিক গণনার জন্য এর সূক্ষ্ম মান জানা দরকার। প্রাচীন কালে আর্যভট এই অতি প্রয়োজনীয় সংখ্যাটির দশমিক চার স্থান পর্যন্ত সঠিক মান নির্ণয় করতে সক্ষম হয়েছিলেন। সে যুগের পরিপ্রেক্ষিতে এটা বিস্ময়কর। বিশেষত, ভারতীয় গণিতের ইতিহাসে তিনিই প্রথম এই কৃতিত্ব ও গৌরবের অধিকারী। তাঁর নিয়মটি এরকম :

"একশ'-র সঙ্গে 4 যোগ করে 8 দিয়ে গুণ করে 62,000 যোগ কর। 'এই ফলটি 20,000 ব্যাস বিশিষ্ট বৃত্তের আনুমানিক পরিধি হবে।"

নিয়মটি আধুনিক গণিতের ভাষায় প্রকাশ করলে,

$$\pi = \frac{\text{পরিধি}}{\text{ব্যাস}} = \frac{8\,(\,100 + 4\,)\; + \;62{,}000}{20{,}000} = 3.1416$$

আর্যভট অবশ্য π-এর মান দশমিকে প্রকাশ করেননি, ভগ্নাংশে করেছিলেন। কারণ তখনও পর্যন্ত দশমিক চিহ্নের আবিষ্কার হয়নি। এ ঘটনা অনেক পরের যুগের।

আচার্য আর্যভট কেবল গণিতজ্ঞ ছিলেন না, তিনি ছিলেন অন্যতম শ্রেষ্ঠ জ্যোতির্বিজ্ঞানী। জ্যোতির্বিজ্ঞানে রয়েছে তাঁর অসামান্য অবদান। পৃথিবীর আহ্নিকগতির ও বার্ষিকগতির কথা কে না জানে? কিন্তু বহুদিন পর্যন্ত মানুষ বিশ্বাস করেনি পৃথিবী নিজ অক্ষে প্রচণ্ডবেগে ঘুরছে, আর ঘুরে ঘুরে সূর্য পরিক্রমা করছে। ভারতে আর্যভট-ই প্রথম পৃথিবীর আহ্নিকগতির কথা বলেন। আহ্নিকগতির ফলেই যে দিন রাত্রি হচ্ছে, একথা বুঝতে তাঁর সময় লাগেনি। নিঃসন্দেহে এটি একটি যুগান্তকারী আবিষ্কার।

অনেকের জানা, এখন মধ্যরাত্রি থেকে সময় গণনা করা হয়। অর্থাৎ আজ মঙ্গলবার হলে আজ রাত্রি বারোটার পর বুধবার পড়ে যায়, মঙ্গলবার থাকবে না। আচার্য আর্যভট সর্বপ্রথম এই নতুন সময় গণনার পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন।

ভারতীয় গণিতের ইতিহাসে আর্যভট নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেন। বিশ্বগণিতের ইতিহাসেও তাঁর মর্যাদাপূর্ণ স্থান।

বরাহমিহির

ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞান ও জ্যোতিষের ইতিহাসে বরাহমিহির এক উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে আছেন। প্রাচীন ভারতে জ্যোতির্বিজ্ঞানের ছিল তিনটি বিভাগ: তন্ত্র অর্থাৎ গাণিতিক জ্যোতির্বিজ্ঞান, হোরা ও সংহিতা। বরাহমিহির এই তিন বিভাগেই ব্যুৎপন্ন ছিলেন। বিশেষত, শেষ দুটিতে তাঁর জুড়ি মেলা ভার।

আর্যভটের পর বরাহমিহিরের আবির্ভাব। পরবর্তী অনেক গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিজ্ঞানী বরাহমিহির সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন। এঁদের মধ্যে আছেন শতানন্দ, শ্রীপতি, নারায়ণ দাস, গণেশ দৈবজ্ঞ প্রমুখ। এমন কি, বিদেশী পণ্ডিতরাও তাঁর প্রশংসা না করে পারেননি। বিখ্যাত আরব পণ্ডিত অলবেরুনী এমনই বরাহমিহিরের ভক্ত ছিলেন যে, তাঁর ত্রুটির সমালোচনা পর্যন্ত করেননি।

বরাহমিহিরের পরিচয়

কিন্তু তাঁর ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। অতি অল্পমাত্র তাঁর গ্রন্থে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে, আর তাঁর গ্রন্থের বিখ্যাত টীকাকার উৎপলের লেখা থেকে সামান্য জানা যায়। তাঁর 'বৃহৎসংহিতা' গ্রন্থের একটি শ্লোকে তিনি বলেছেন যে তাঁর পিতার নাম আদিত্যদাস এবং তিনি অবন্তী বা উজ্জয়িনীর অধিবাসী। কপিত্থক নামক স্থানে সূর্যের আশীর্বাদে তিনি জ্যোতির্বিজ্ঞানে জ্ঞানার্জন করেন। অবশ্য এ-বিষয়ে প্রাথমিক পড়াশোনা তিনি পিতার কাছেই করেন।

'কপিত্থক' স্থানটি কোথায় তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, কপিত্থক না হয়ে হবে 'কাম্পিল্যক'। উত্তর প্রদেশের ঝাঁসির নিকট কল্পি প্রাচীনকালের কাম্পিল্যক। কিন্তু বিখ্যাত

ভাষ্যকার উৎপল বলেন, কপিত্থক একটি গ্রাম, এখানে সূর্যমন্দির ছিল। বর্তমানে এখানে খননকার্য চালিয়ে পুরাতন একটি জায়গা পাওয়া গেছে বটে, কিন্তু তার সঙ্গে কপিত্থকের কোন মিল নেই। আবার বিদেশী পর্যটক য়ুয়ান চুয়াং-এর মতে উত্তর প্রদেশের ফারুকাবাদ জেলার শঙ্কিসা শহর কপিত্থ নামে পরিচিত ছিল। পণ্ডিতদের নানা মত থেকে মনে হয়, বরাহমিহির শঙ্কিসায় জন্মগ্রহণ ও পড়াশোনা করে পরে উজ্জয়িনীতে গিয়ে বসবাস করেন।

বরাহমিহির ছিলেন সূর্যের উপাসক। তাঁর পিতার নাম আদিত্যদাস। এই নামের মধ্যেও সূর্যের নাম যুক্ত হয়েছে। তাঁর নিজের নামের শেষে মিহির রয়েছে। মিহির শব্দের অর্থও সূর্য। তা ছাড়া সূর্যদেবতার উদ্দেশ্যে তিনি অনেক স্তব-স্তুতি রচনাও করেছেন। এ থেকে স্পষ্ট মনে হয়, বরাহমিহিরের পারিবারিক দেবতা ছিলেন সূর্য। তাঁর পুত্র পৃথুযশও সূর্যের বন্দনা করে শ্লোক রচনা করেছেন।

কিংবদন্তী প্রচলিত আছে যে, বরাহমিহির সম্রাট বিক্রমাদিত্যের সভাসদ ছিলেন। তিনি ছিলেন রাজজ্যোতিষী। এ নিয়ে নানা গল্প ও কাহিনী কম নেই। কিন্তু ওইসব গল্প বা কাহিনীর কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই। তবে বরাহমিহির রাজার জন্য জ্যোতিষী নিয়োগের গুরুত্বের কথা যেভাবে বলেছেন, তা থেকে এরূপ মনে হয় তিনি হয়তো কোন রাজার সভা অলঙ্কৃত করতেন। কিন্তু কে সেই রাজা? সে-বিষয়ে নিশ্চিত করে কিছু বলা যায় না। পণ্ডিতরা বলেন, সেই রাজা উজ্জয়িনীর হর্ষ বিক্রমাদিত্য ; আবার অন্য পণ্ডিতরা বলেন, সেই রাজা দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য। যাই হোক, এ-বিষয়ে নিশ্চিত ঐতিহাসিক প্রমাণ না পাওয়া গেলে কোন সিদ্ধান্ত করা যায় না।

বিদেশ ভ্রমণ

বরাহমিহির বিদেশ ভ্রমণ করেছিলেন বলে একটি কথা চালু আছে। অনেকে মনে করেন, তিনি সম্ভবত যবন দেশ ভ্রমণ

করেছিলেন। পহ্লবী ভাষায় বিখ্যাত পঞ্চতন্ত্র গ্রন্থের অনুবাদ রয়েছে। এই অনুবাদকের নাম বুজ্রজ্মেহ্র (Buzurjmehr)। এই অনুবাদ নাকি পারস্যের সম্রাট খুসরু নুসিরওয়ানের নির্দেশে হয়। পারস্য সম্রাটের রাজত্বকাল 531 থেকে 576 খ্রীস্টাব্দ। প্রখ্যাত এক পণ্ডিতের মতে বরাহমিহিরের পূর্বে 'বরাহ' নামটি প্রকৃত নাম নয়। তাঁর প্রকৃত নাম বৃহন্ম্ত্র। কিন্তু অনেকে এই মত স্বীকার করেন না। যাই হোক, বরাহমিহির বিদেশ ভ্রমণ করতে পারেন। এবং খুব সম্ভব গ্রীস বা রোম ভ্রমণ করে থাকবেন। কারণ, তাঁর জ্যোতির্বিজ্ঞান গ্রন্থে অনেক গ্রীক পরিভাষা পাওয়া যায়।

গল্প-কাহিনী

আমরা আগেই বলেছি, বিখ্যাত ব্যক্তিদের নিয়ে নানা কাহিনী, গল্প ও কিংবদন্তী গড়ে ওঠে। বরাহমিহিরকে নিয়েও নানা গল্প-কাহিনী রয়েছে। সংক্ষেপে দু-একটি কাহিনীর উল্লেখ করা হলো।

কাঞ্চীর রাজা বিখ্যাত জ্যোতিষী সত্যদত্ত। তাঁর পুত্রের নাম পূষণ। মৃত্যুর পর পূষণ সূর্যলোকে গমন করল। সূর্যদেব ভবিষ্যৎ বাণী করলেন পূষণ উজ্জয়িনীর রুদ্রপণ্ডগৃহে মিহিরাচার্যরূপে জন্মগ্রহণ করবে। কিন্তু জন্মের পর তাকে নদীতে বিসর্জন দেওয়া হলো। ভাসতে ভাসতে পূষণ লঙ্কায় পৌঁছল। রাক্ষসীদের দ্বারা লালিত-পালিত হয়ে জ্যোতির্বিজ্ঞান অধ্যায়ন করল। পরে বিভীষণ তাকে উজ্জয়িনীতে পাঠিয়ে দিলেন। এখানে জ্যোতিষের তিনটি বিভাগ তিনি পুনর্গঠিত করলেন। কিন্তু সবই ম্লেচ্ছদের হাতে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

আর একটি কিংবদন্তী অনুসারে, বিখ্যাত মীমাংসক সর্বস্বামীন চার বর্ণ থেকে চারটি বিবাহ করেন। বরাহমিহির ব্রাহ্মণীর ভর্তৃহরি ও বিক্রম ক্ষত্রিয়ার, হরিচন্দ্র ও শঙ্ক বৈশ্যার ও অমর শূদ্রার গর্ভজাত। সর্বস্বামীনের প্রকৃত নাম আদিত্যদেব, এবং তিনি 100 থেকে 500 খ্রীস্টাব্দের মধ্যে বর্তমান ছিলেন। আমরা আগেই বলেছি, বরামিহিরের

পিতার নাম আদিত্যদাস। সুতরাং পিতার নামের দিক থেকে কিছুটা মিল দেখা যায়। কিন্তু একজন মীমাংসক, আর অপরজন জ্যোতিষী।

আর একটি কিংবদন্তী জৈনদের প্রচার। তাঁরা বলেন, বরাহমিহির ভদ্রবাহুর ভাই। শ্বেতাম্বররা বলেন, গোদাবরী নদীর তীরে প্রতিষ্ঠান বা পৈখানা নগরে ভদ্রবাহু ও বরাহমিহির দু-ভাই ছিলেন। ভদ্রবাহুর গুরু যশোভদ্র শিষ্য ভদ্রবাহু ও সম্ভূতবিজয়কে আচার্য পদে প্রতিষ্ঠিত করায় বরাহমিহির ক্ষোভে ও দুঃখে জৈনধর্ম ত্যাগ করেন। 'বৃহৎ-সংহিতা' নামে জ্যোতিষশাস্ত্র রচনা করে তিনি বিখ্যাত হন। অশিক্ষিত জনগণের মধ্যে তিনি প্রচার করেন, সূর্যদেবের আহ্বানে তিনি সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড ও গ্রহ-নক্ষত্র জগৎ দেখে এসেছেন। এইভাবে বিদর্ভ দেশের রাজার অনুগ্রহ লাভ করেন, এবং তাঁর পরামর্শ অনুযায়ী রাজা জৈনদের রাজ্য থেকে বিতাড়িত করেন।

জৈনদের এই দুর্দশা দেখে ভদ্রবাহু বরাহমিহিরকে তর্কযুদ্ধে আহ্বান করলেন। বরাহমিহির পরাজিত হয়ে ক্ষোভে ও দুঃখে প্রাণত্যাগ করলেন। কিন্তু মরেও তিনি ছাড়লেন না, জৈনদের ঘরে ঘরে নানা রকম রোগের বীজ ছড়াতে লাগলেন অপদেবতা হয়ে।

বরাহমিহিরকে কেন্দ্র করে যে তিনটি গল্প-কাহিনীর কথা বলা হলো প্রকৃতপক্ষে এসবের কোন ঐতিহাসিক মূল্য নেই।

অবদান ও কৃতিত্ব

বরাহমিহির আর্যভটের সমসাময়িক। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'পঞ্চ-সিদ্ধান্তিকা' 505 খ্রীস্টাব্দে রচিত। এটিই তাঁর প্রথম রচনা। এই গ্রন্থে পাঁচটি জ্যোতির্বিজ্ঞান সংক্রান্ত বই-এর সারসঙ্কলন আছে। পাঁচটি গ্রন্থের নাম : 'পৌলিশ সিদ্ধান্ত,' 'রোমক সিদ্ধান্ত,' 'বাশিষ্ঠ সিদ্ধান্ত,' 'সৌর সিদ্ধান্ত' ও 'পৈতামহ সিদ্ধান্ত'। 'পঞ্চসিদ্ধান্তিকা' জ্যোতি-বিজ্ঞানের একটি মূল্যবান ইতিহাস। আলোচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে সৌর সিদ্ধান্ত ছাড়া বাকীগুলি অবলুপ্ত। পৌলিশ ও রোমক সিদ্ধান্ত গ্রীকদের রচনা বলে মনে করা হয়। বরাহমিহিরে অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি 'বৃহৎ-

সংহিতা'। এতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা বিষয় আলোচিত হয়েছে। এই গ্রন্থে আলোচিত বিষয়ের ব্যাপকতার কথা ভাবলে তাঁর বিশ্বকোষসদৃশ জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। এই বইটি তাঁর শেষ বয়সের রচনা। এই দুটি বিখ্যাত গ্রন্থ ছাড়াও ছোট-বড় অনেক বই তিনি প্রণয়ন করেছিলেন।

গণিতজ্ঞ হিসাবে বরাহমিহির আর্যভট-ব্রহ্মগুপ্ত-ভাস্করাচার্যের সমতুল্য নন। এমন কি, জ্যোতির্বিজ্ঞানেও তাঁর তেমন মৌলিক আবিষ্কার নেই। তবে জ্যোতির্বিজ্ঞান ও জ্যোতিষের ঐতিহাসিক হিসাবে তাঁর অবদান শ্রদ্ধার সহিত স্মরণীয়।

তিনি আর্যভটের অনেক মতবাদ স্বীকার করেননি, এবং তাঁর তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। এরূপ না করলে গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞানে আরো উন্নতি হতে পারত। আর্যভট যে নব অধ্যায়ের সূচনা করেছিলেন, বরাহমিহির প্রমুখ অনেকে বিরোধিতা না করলে ভারতীয় গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞানে প্রতিভাবানদের আবির্ভাব ত্বরান্বিত হতো, সন্দেহ নেই।

আসামীর কাঠগোড়ায়

জ্ঞান বিজ্ঞানে ভারতে অগ্রগতি হয়েছে, অন্তত কিছু কিছু ক্ষেত্রে তো বটেই। আমরা পরমাণু যুগে প্রবেশ করেছি, মহাকাশ যুগেও পিছিয়ে নেই। কিন্তু সমাজের এমন একটি ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে এই অগ্রগতির সাফল্য প্রভাব বিস্তার করেছে যে, শতকরা হিসাবে দেখলে লজ্জাকর হয়ে উঠবে। বিশাল দেশের জনগনের মধ্যে কোন চেতনার প্রকাশ দেখা যাচ্ছে না, বিজ্ঞান চেতনার এমন দৈন্য আর কোন দেশে আছে কিনা সন্দেহ। যুগ যুগ ধরে মানুষ নানা কুসংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাসে আচ্ছন্ন হয়ে আছে। তা থেকে বেরিয়ে আসার প্রয়াস দেখা যাচ্ছে না। পরিস্থিতি মোটেই অনুকূল নয়, বরং দিন দিন নানা কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস নানা মোড়কে প্রকাশ পাচ্ছে। এই অশুভ দিকটি নিয়ে বিজ্ঞানী মহলে, চেতনাসম্পন্ন মানুষের মনে তেমন প্রতিবাদ

দেখা যাচ্ছে না। তবে একদল বিজ্ঞানকর্মীদের মধ্যে চেতনার উদয় হয়েছে, এবং তার প্রতিবাদ দেখা যাচ্ছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এইসব প্রতিবাদ, বিদ্রোহ ইত্যাদির মধ্যে যতখানি রোষ, ক্রোধ ও আক্রমণ আছে, তার চেয়ে অনেক কম যুক্তি বিচার আছে। খারাপ বললেই কোন কিছু খারাপ হয়ে যায় না, অস্বীকার করলেই সত্য প্রতিষ্ঠা হয় না। তথ্যসমৃদ্ধ ও যুক্তিপূর্ণ আলোচনা চাই। কিন্তু তেমনটি দেখা যাচ্ছে না বেশীর ভাগ লেখার মধ্যে।

প্রকৃত বিজ্ঞানচেতনাসম্পন্ন ভাগ্য, বিধিলিপি ইত্যাদি বিশ্বাস করেন বলে মনে হয় না। জ্যোতিষ নিয়ে আলোচনাকালে প্রায়শ বরাহমিহিরের প্রতি দোষারোপ ও আক্রমণ করা হয়। বরাহমিহিরকে আসামীর কাঠগোড়ায় দাঁড়িয়ে বিচার করার চেষ্টা করা হয়। একথা সত্য, জ্যোতিষ সম্পর্কে বরাহমিহির যে-সব উক্তি করেছেন, তা বিজ্ঞান সম্মত নয়,—তার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। কিন্তু একথাও মানতে হবে প্রায় চোদ্দশ' বছর আগে সেই সমাজ ও সংস্কৃতির মধ্যে লালিত পালিত হয়ে তাঁর পক্ষে ওরকম অবৈজ্ঞানিক উক্তি করা অসম্ভব নয়। বিজ্ঞান এগিয়ে চলে। বিজ্ঞানে ধ্রুবসত্য বলে কিছু নেই, সবই আপেক্ষিক। এ শিক্ষা এই শতাব্দীর। এমন বিজ্ঞান-চেতনার অধিকারী হওয়া বরাহমিহিরের পক্ষে সম্ভব ছিল না। সমালোচনা করলে দেশ-কাল ভুললে চলবে না। তাই, কোপার্নিকাস, বরাহমিহিরকে কাঠগোড়ায় না তুলে এ যুগের বিজ্ঞানচেতনাহীনদের বরং তোলা উচিত। বরাহমিহিরের গ্রন্থে যতটুকু ইতিহাস, আছে, সারবস্তু আছে তা গ্রহণযোগ্য, আবার তাঁর ভ্রান্ত ধারণাগুলি অবশ্যই পরিহার করতে হবে। যাঁরা তাঁকে সম্পূর্ণ মেনে চলেন তাঁদের দোষ, না বরাহমিহিরের? আমাদের বক্তব্য বরাহমিহিরের ভ্রান্ত ধারণাগুলি আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকে বিচার করে খণ্ডন করা হোক, কিন্তু তাঁর প্রতি অশোভন উক্তি পরিহার করা হোক। তা ছাড়া কুসংস্কার, ভ্রান্ত ধারণা দূরীভূত করতে গেলে সহানুভূতি সম্পন্ন হতে হয়, বিদ্রূপ, কটাক্ষ ও রোষ প্রকাশের মাধ্যমে হয় না।

প্রথম ভাস্কর

একাধিক আর্যভটের মত একাধিক ভাস্কর আছেন। একজন খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। ইনি প্রথম ভাস্কর নামে পরিচিত। আর দ্বিতীয় জন দ্বাদশ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। ইনি দ্বিতীয় ভাস্কর বা কেবল ভাস্করাচার্য নামে পরিচিত। প্রথম ভাস্করের চেয়ে দ্বিতীয় ভাস্করের পরিচিতি বেশী, খ্যাতি ও সম্মানও অধিক।

ইতিমধ্যে আর্যভট নামে উপগ্রহের কথা বলেছি। ভারতীয় মহাকাশ সংস্থা ভাস্কর নামেও ছুটি উপগ্রহ মহাকাশে প্রেরণ করেন। উপগ্রহ ছুটির নাম ভাস্কর-1 ও ভাস্কর-2। ভারতের ছুই মহান গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিদকে সম্মানিত করে মহাকাশ গবেষণা সংস্থা আমাদের অনেকের আনন্দ বৃদ্ধি করেছেন, সন্দেহ নেই।

ভাস্কর পরিচিতি

প্রথম ভাস্কর কোথায় জন্মগ্রহণ করেন, তা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। পণ্ডিতরা বলেন, তাঁর জন্মস্থান সৌরাষ্ট্রের (আধুনিক গুজরাট) বলভী, আবার কেউ কেউ বলেন তাঁর জন্মস্থান মগধ। এমন কি, কেরালার কোন স্থানেও তিনি জন্মগ্রহণ করে থাকবেন, এমন মতও পোষণ করা হয়। পণ্ডিতদের মতে, ভাস্কর 450 শকাব্দে বর্তমান ছিলেন।

তাঁর গ্রন্থে তিনটি স্থানের নাম পাওয়া যায়—বলভী, ভরুকচ্ছাপ্ল ও শিবভাগপুর। বলভী ও ভরুকচ্ছাপ্ল একই প্রদেশের অন্তর্গত, এবং উভয়ের মধ্যে দূরত্ব খুব বেশী নয়। তাঁর গ্রন্থে আবার মগধেরও উল্লেখ রয়েছে। এইসব উল্লেখ ও আরো কিছু কারণ থেকে অনুমান হয়, তিনি বলভী অথবা মগধের অধিবাসী ছিলেন। তবে পণ্ডিতরা তাঁকে বলভীবাসী বলতেই বেশী আগ্রহী। তাঁরা বলেন, ভাস্কর মগধে গিয়ে কুসুমপুরে পড়াশোনা করেন, এবং পরে দেশে ফিরে আসেন। তাঁর কর্মক্ষেত্র হয় বলভী, নয় ভরুকচ্ছাপ্ল।

গ্রন্থ পরিচয় ও প্রভাব

ভাস্কর আচার্য আর্যভটের শিষ্য ছিলেন। গুরুর প্রতি তাঁর অসীম শ্রদ্ধা ছিল। আচার্য আর্যভটের 'আর্যভটীয়' গ্রন্থখানি সূত্রাকারে লেখা বলে বোঝা খুবই কঠিন। ভাস্কর এই গ্রন্থের টীকা-ভাষ্য রচনা করেন। তাঁর টীকা পরবর্তীকালের গণিতজ্ঞদের পক্ষে আর্যভটীয় বুঝতে খুবই সহায়ক হয়েছিল। এমন কি, তাঁর টীকা না থাকলে আর্যভটীয়ের বহু অংশ বোঝা যেত কিনা সন্দেহ। তবে আর্যভটীয়-টীকা রচনার আগে তিনি ওই গ্রন্থ অবলম্বনে আরো গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর 'বৃহৎ ভাস্করীয়' বা 'মহাভাস্করীয়' 'আর্যভটীয়ভাষ্য' লেখার আগে রচিত হয়। এই বইটির ছাত্র উপযোগী আর একটি সংস্করণ রচনা করেন তিনি। তার নাম 'লঘুভাস্করীয়'।

আর্যভটের মত ও পথে প্রথম ভাস্করের সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল। তাঁর তিনটি গ্রন্থের মধ্য দিয়ে তিনি নিজ প্রতিভা গুরুর মতবাদ ব্যাখ্যা ও প্রচারেই নিয়োগ করেছেন। গণিতে আর্যভট সদৃশ প্রতিভা তাঁর ছিল না সত্য, কিন্তু যে কৃতিত্ব তিনি অর্জন করেছিলেন, তার মূল্য কম নয়। হয়তো গুরুর অলৌকিক প্রতিভার আলোকে আচ্ছন্ন হওয়ার জন্যই তিনি আপন প্রতিভা বিকাশের যথাযথ সুযোগ পাননি। তা হলেও পরবর্তী গণিতাচার্যদের ওপর তাঁর প্রভাব কম নয়। তাঁর 'ভাস্করীয়' গ্রন্থ দুটির বহু ভাষ্য বিভিন্ন গণিতজ্ঞরা রচনা করেছিলেন। শঙ্করনারায়ণের লঘুভাস্করীয়ের টীকা সবচেয়ে পুরোনো। সূর্যদেব যদ্বা 'গোবিন্দসাম্য' নামে মহাভাস্করীয়ের টীকা রচনা করেন। পরমেশ্বর 'সিদ্ধান্তদীপিকা' নামে ভাষ্য ও মহাভাস্করীয়ের টীকা লেখেন। মক্কিভট্ট 'গণিতবিলাস' নামে মহাভাস্করীয়ের টীকা লেখেন। শ্রীকণ্ঠ মহাভাস্করীয় ও লঘুভাস্করীয়ের টীকা লেখেন। উদয়নারায়ণ জ্যোতিষভট্ট লঘুভাস্করীয়ের ব্যাখ্যা রচনা করেন। এসব থেকে মনে হয়, প্রথম ভাস্কর নিজ প্রতিভা কেবলমাত্র গাণিতিক ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণে নিয়োগ করলেও তাঁর মৌলিকতা কম ছিল না।

গুরু প্রশস্তি

আর্যভটের শিষ্যরা গুরুকে 'ভগবান' বা 'প্রভু' বলে সম্বোধন করতেন। প্রথম ভাস্কর তাঁর গ্রন্থে গুরু সম্পর্কে একাধিক স্থানে প্রশংসা করেছেন। এক জায়গায় তিনি লিখেছেন, "আর্যভট ছাড়া আর কেউ গ্রহ-নক্ষত্রদের গতি সম্বন্ধে কিছুই জানত না। অন্যেরা কেবল অজ্ঞতার গাঢ় অন্ধকারে ঘুরে মরত।" জানি না, এই উক্তি বরাহমিহিরের সম্পর্কে কি না। কারণ, তিনি আর্যভটের সমালোচনা করেছিলেন।

পাণ্ডিত্য ও বৈশিষ্ট্য

ভাস্কর কেবলমাত্র গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিদই ছিলেন না। জ্ঞানের নানা শাখায় তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। এরকম পাণ্ডিত্য অন্যান্য গণিতজ্ঞদের মধ্যে দুর্লভ বললেই চলে। তাঁর আর্যভটীয় ভাষ্যে নানা বিষয় থেকে উদ্ধৃতি রয়েছে। এই উদ্ধৃতি থেকে মনে হয়, তিনি ব্যাকরণ, বেদান্ত, মীমাংসা, অর্থশাস্ত্র, মনুস্মৃতি ইত্যাদি বিষয়ে সুপণ্ডিত ছিলেন। গভীর পাণ্ডিত্য ও দার্শনিকতাবোধের জন্যই সম্ভবত তিনি শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

আমরা আগেই বলেছি, ভাস্কর সৃজনশীল গণিতজ্ঞ নন, কিন্তু গণিতে যে তাঁর অসামান্য দখল ছিল তাতে সন্দেহ নেই। আর্যভট অনির্ণেয় সমীকরণ সমাধান আবিষ্কার করেন। কিন্তু তাঁর পদ্ধতির পরিপূর্ণ রূপ ও ব্যাখ্যা ভাস্করের হাতেই হয়েছে। পরবর্তীকালে ব্রহ্মগুপ্ত, দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য প্রমুখ গণিতাচার্যদের হাতে এই বিষয়টি আরো সমৃদ্ধ হয়।

গণক-চক্র-চূড়ামণি ব্রহ্মগুপ্ত

কয়েকজন প্রাচীন ভারতীয় বিজ্ঞানী ও গণিতাচার্য যে অতীতকালে আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেছিলেন, তার কিছু উল্লেখ ইতিমধ্যে আমরা করেছি। কিন্তু ব্রহ্মগুপ্ত সর্বভারতীয় খ্যাতি ছাড়াও গণিতাচার্য ও জ্যোতিষাচার্য হিসাবে বিদেশী সভ্যতায় প্রভূত প্রভাব বিস্তার করতে

সমর্থ হয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, আরব সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে রয়েছে তাঁর অসামান্য অবদান। আধুনিক আরব বিজ্ঞান ঐতিহাসিকরা একথা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকারও করেন। আমাদের গর্বের বিষয় এই যে, সপ্তম শতাব্দীর বিশ্বগণিতের ইতিহাসে এমন মৌলিক প্রতিভা দেখা যায় না বললেই চলে।

জীবনীসূত্র

আচার্য ব্রহ্মগুপ্ত 598 খ্রীস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম জিষ্ণু গুপ্ত। গুজরাটের ভীনমাল বা শ্রীমাল তাঁর জন্মস্থান বলে অনুমান করা হয়। তখন চাপ বংশীয় রাজা ব্যাঘ্রমুখের রাজত্বকাল। অনেক প্রাচীন বিজ্ঞানী ও গণিতজ্ঞদের সময়কাল নির্ণয় করা কঠিন। কিন্তু আমাদের সৌভাগ্য, ব্রহ্মগুপ্ত তাঁর গ্রন্থে সময়কাল নির্দেশ করেছেন। সুতরাং 598 খ্রীস্টাব্দ সঠিক কাল, এতে কোন সংশয় নেই।

ব্রহ্ম-স্ফুট-সিদ্ধান্ত

যে-বইটি লিখে ব্রহ্মগুপ্ত বিশ্বখ্যাতি অর্জন করেন, তার নাম 'ব্রহ্ম-স্ফুট-সিদ্ধান্ত'। বইটি তিনি মাত্র তিরিশ বছর বয়সে লেখেন। আর্যভটীয়-এর মত এই বইটিও ছন্দে লেখা এবং জায়গায় জায়গায় অর্থ করা কঠিন। নবম শতাব্দীতে পৃথ্‌দকস্বামী নামে এক মহাপণ্ডিত গণিতজ্ঞ এই গ্রন্থের টীকা-ভাষ্য রচনা করেন। পৃথ্‌দকস্বামীর বইটি ব্রহ্ম-স্ফুট-সিদ্ধান্ত বুঝতে খুব সাহায্য করে। ব্রহ্মগুপ্ত পরিণত বয়সে আরো একটি জ্যোতির্বিজ্ঞানের বই লেখেন। নাম 'খণ্ডখাদ্যক'। ব্রহ্ম-স্ফুট-সিদ্ধান্তের রচনাকাল 628 খ্রীস্টাব্দ, এবং খণ্ডখাদ্যকের 665 খ্রীস্টাব্দ। জ্যোতির্বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য খণ্ডখাদ্যকের বহুল ব্যবহার হতো।

আমরা আগেই বলেছি, আর্যভটীয় গ্রন্থটি ছোট, কিন্তু ব্রহ্ম-স্ফুট-সিদ্ধান্ত মোটেই ছোট নয়—বেশ বড়। সাত গুণেরও বেশী। এতে মোট 24টি অধ্যায় রয়েছ, শ্লোকের সংখ্যা হাজারের ওপর। এই বিশাল গ্রন্থটির বেশীর ভাগ জায়গায় জ্যোতির্বিজ্ঞানের আলোচনা আছে।

বাইশটি অধ্যায়ের মধ্যে মাত্র সাড়ে চারটি অধ্যায়ে বিশুদ্ধ গণিতের আলোচনা দেখা যায়। জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রধান প্রধান আলোচ্য বিষয় হচ্ছে গ্রহদের গড় গতি ও প্রকৃতগতি। স্থান-কাল-দূরত্ব সম্পর্কে নানা সমস্যা, সূর্যগ্রহণ, চন্দ্রগ্রহণ, ইত্যাদি। গ্রহণ সম্পর্কে সঠিক ধারণা, আর তা প্রচার করা ব্রহ্মগুপ্তর অবিস্মরণীয় কীর্তি। তাঁর আগে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা 'রাহু-কেতু' গ্রহণের মুলে বলে বিশ্বাস করতেন। কিন্তু তিনি রাহু-কেতুর কাল্পনিক ধারণা একেবারে নস্যাৎ করে দেন, এবং বলেন, চন্দ্র ও পৃথিবী ছায়া বিস্তার করে বলেই গ্রহণ হয়। সে-যুগের দেশ-কাল-সমাজ ও সংস্কৃতির পরিপ্রেক্ষিতে এই মত পোষণ ও প্রচার করা যে কি দুঃসাহসিক ব্যাপার, তা বোঝা খুব সহজ নয়। প্রকৃতপক্ষে, এটি বিপ্লবাত্মক ও যুগান্তকারী মন্তব্য।

ব্রহ্ম-স্ফুট-সিদ্ধান্তে ব্রহ্মগুপ্ত তাঁর আগের যুগের জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের অনেক মতের আলোচনা করেছেন। ফলে, তাঁর বই থেকে আমরা অনেক জ্যোতির্বিজ্ঞানীর নাম জানতে পারি, আবার তাঁদের মতবাদও সামান্য জানার সুযোগ হয়। এইভাবে আর্যভট, লাট, শ্রীসেন, বিষ্ণুচন্দ্র, প্রত্যুম্ন প্রমুখের মতবাদ জানা যায়, তাঁদের ত্রুটিও আমাদের নজরে আসে। এতে জ্যোতির্বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশের দিকটি বেশ স্পষ্ট হয়।

সবার জানা, জ্যোতির্বিজ্ঞানের গবেষণা যন্ত্রপাতি ছাড়া সম্ভব নয়। চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র ইত্যাদি নিয়ে যেখানে আলোচনা, সেখানে খালি চোখে এদের গতিবিধি, সঠিক অবস্থান ইত্যাদি নিরূপণ সম্ভব নয়। সুতরাং জ্যোতির্বিজ্ঞানে যন্ত্রপাতি অপরিহার্য। আধুনিক যুগে অনেক সূক্ষ্ম ও জটিল যন্ত্রপাতি যেমন আবিষ্কৃত হয়েছে, তেমনি আবার কৃত্রিম উপগ্রহের মধ্য দিয়ে পর্যবেক্ষণও চালানো হয়। উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন রকেট পাঠিয়ে দূরবর্তী গ্রহ পর্যবেক্ষণও করা হয়। সেই প্রাচীনকালেও যন্ত্রপাতির ব্যবহার ছিল, যদিও তা আজকের তুলনায় নগণ্য। ব্রহ্ম-স্ফুট-সিদ্ধান্তে নানা ধরনের যন্ত্রপাতির আলোচনা আছে। এ থেকে প্রমাণিত হয়, আমাদের দেশের প্রাচীন জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা খালি চোখে আকাশ পর্যবেক্ষণ করতেন না,—যন্ত্রপাতির সাহায্য গ্রহণ করতেন।

গণিতে অবদান

আধুনিক গণিতের অনেক শাখা-প্রশাখা—প্রায় একশ'। কিন্তু প্রাচীন গণিতে এত শাখা ছিল না, মাত্র তিনটি : পাটীগণিত, বীজ-গণিত ও জ্যামিতি। এই তিন শাখার মধ্যে পাটীগণিতে ব্রহ্মগুপ্তের তেমন বিস্ময়কর অবদান নেই। পাটীগণিতের আলোচনায় পূর্বাচার্যদের অনুসরণ করেছেন মাত্র। কিন্তু বীজগণিত ও জ্যামিতিতে তাঁর বিস্ময়কর অবদান। আর তা শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করার যোগ্য। সত্যি কথা বলতে কি, তাঁর প্রতিভার পক্ষে বীজগণিত ও জ্যামিতি আনুকূল্য প্রকাশ করেছিল।

আমাদের এই ক্ষুদ্র বই-এ ব্রহ্মগুপ্তের গাণিতিক প্রতিভার সম্পূর্ণ বিবরণ দেওয়া সম্ভব নয়। বীজগণিতে তাঁর কয়েকটি অবদানের উল্লেখ ও দু-একটি সহজ অঙ্ক উদাহরণ হিসাবে দেখানো হবে। জ্যামিতি প্রসঙ্গে দু-একটি উপপাদ্যের বিবৃতি ও গুরুত্ব নিয়ে দু-চার কথা বলা হবে মাত্র।

বীজগণিতে কৃতিত্ব

বীজগণিত ব্রহ্মগুপ্তের প্রিয় বিষয়। দ্বিঘাত অনির্ণেয় সমীকরণের বীজ নির্ণয় তাঁর এক অবিস্মরণীয় কীর্তি। গণিতের ইতিহাসে এ-ধরনের সমীকরণ 'পেলিয়ান সমীকরণ' বলে পরিচিত। অথচ ব্রহ্মগুপ্ত ডঃ পেলের বহুপূর্বে এই সমীকরণের সমাধান পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। তাই প্রকৃতপক্ষে এই সমীকরণের নামকরণ করা উচিত "ব্রহ্মগুপ্ত সমীকরণ"।

প্রাচীনকাল থেকেই আমাদের দেশে ভগ্নাংশের ব্যবহার প্রচলিত ছিল। কিন্তু এ-বিষয়ে কোন সূত্র দেখা যায় না। অথচ সূত্র থাকলে খুব সহজে ভগ্নাংশের কাজ সম্পন্ন করা যায়। ব্রহ্মগুপ্ত সর্বপ্রথম ভগ্নাংশ বিষয়ক সূত্র আবিষ্কার করেন।

যে কোন ভগ্নাংশের আকার : $\frac{\text{লব}}{\text{হর}} = \frac{a}{b}$। এই $\frac{a}{b}$ আকারের

ভগ্নাংশকে সরল করার নিয়ম বা সূত্র গণিতের ভাষায় এরকম :

$$\frac{a}{b} = \frac{a}{b+h} + \left(\frac{a}{b+h}\right)\frac{h}{b}$$

এখানে, a = লব, b = হর ও h = একটি কাল্পনিক সংখ্যা।

এবার একটি উদাহরণের সাহায্যে সূত্রটির প্রয়োগ দেখানো যাক।

উদাহরণ :

$\frac{1920}{93}$, এখানে লব (a) = 1920, হর (b) = 93 ;

এবার একটি কাল্পনিক সংখ্যা ধরে নিতে হবে। এই কাল্পনিক সংখ্যাটি এমন হবে যাতে হরের সঙ্গে যোগ করার পর লবকে ভাগ করা যায়। আমাদের উদাহরণটিতে কাল্পনিক সংখ্যা h = 3 ধরলেই হবে। উপরের সূত্রে সংখ্যাগুলি বসালে,

$$\frac{a}{b} = \frac{1920}{93} = \frac{a}{b+h} + \left(\frac{a}{b+h}\right)\frac{h}{b}$$

$$= \frac{1920}{93+3} + \left(\frac{1920}{93+3}\right)\frac{3}{93} = \frac{1920}{96} + \frac{1920}{96} \times \frac{3}{93}$$

$$= 20\frac{60}{93}\text{।}$$

যে কোন সংখ্যার বর্গ নির্ণয়ের সূত্র

আজ থেকে প্রায় তেরশ' বছর আগে ব্রহ্মগুপ্ত বীজগণিতের সূত্রের সাহায্যে যে-কোন সংখ্যার বর্গ নির্ণয় কিভাবে সহজে করা যায়, তার নিয়ম দিয়েছেন। এটিতেও তাঁর কৃতিত্ব কম নয়। স্কুলের অনেক ছাত্র-ছাত্রী অবশ্য এই সূত্রটি জানে। এটি অন্য কোন নতুন সূত্র নয়, $a^2 - b^2$ সূত্র।

এই বিষয়ে ব্রহ্মগুপ্তের সূত্রটি হচ্ছে, যদি a ও b যে কোন দুটি সংখ্যা হয়, তা হলে,

$$a^2 = (a+b)(a-b) + b^2\text{।}$$

যদি কেবল a সংখ্যাটি দেওয়া থাকে, তাহলে আর একটি কাল্পনিক সংখ্যা ধরে নিতে হবে। একটি উদাহরণ নেওয়া যাক।

উদাহরণ : 77^2 = কত ?

এখানে $a = 77$, $b = 3$ (কাল্পনিক সংখ্যা)

সুতরাং $77^2 = (77 + 3)(77 - 3) + 3^2 = 80.74 + 9 = 5929$।

দ্বিঘাত সমীকরণের সমাধান অতি প্রাচীন কাল থেকেই ভারতে দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু সমাধান পদ্ধতি দেখতে পাওয়া যায় না। ব্রহ্মগুপ্ত সুদকষা অঙ্কের মাধ্যমে এর সমাধান পদ্ধতি দিয়েছেন।

জ্যামিতিতে অবদান

শুল্বসূত্রের জ্যামিতি নিয়ে সামান্য আলোচনা করা হয়েছে। আচার্য আর্যভট ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলের সূত্র দিয়েছেন, আর সমকোণী ত্রিভুজের ধর্ম বিষয়ে তাঁর কোন সংশয় ছিল না। তবুও তাঁর আলোচনার মধ্যে সংক্ষিপ্ততা ও অসম্পূর্ণতা দেখা যায়। মনে হয়, তিনি যদি আরোও গভীরভাবে ও বিস্তারিতভাবে আলোচনা করতেন, তাহলে ভাল হতো। এই যে আমাদের প্রত্যাশা, তা অনেকখানি মিটিয়েছেন আচার্য ব্রহ্মগুপ্ত। কিন্তু একটি জিনিস নিয়ে খুব আশ্চর্য হওয়ার আছে। প্রাচীন গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞান গ্রন্থে "ত্রিভুজ"কে "ত্রিভূজ" নামে অভিহিত করা হয়েছে, অথচ ব্রহ্মগুপ্ত ত্রিভুজকে "একবাহুহীন চতুর্ভুজ" বলে বর্ণনা করেছেন।

ব্রহ্মগুপ্ত ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলের দুটি সূত্র দিয়েছেন। একটি হচ্ছে স্থূল ক্ষেত্রফল, আর অন্যটি সূক্ষ্ম ক্ষেত্রফল। প্রথম সূত্রটি দিয়ে সাধারণভাবে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করা যায়। যেখানে সূক্ষ্মভাবে ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের দরকার নেই, সেখানেই কেবল এই সূত্রটি ব্যবহার করা যেতে পারে। সূত্রটি এরকম :

$$\text{ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল} = \frac{\text{ভূমি}}{2} \times \frac{\text{অপর বাহুদ্বয়ের সমষ্টি}}{2}\text{।}$$

আবার যে-সব ক্ষেত্রে সূক্ষ্ম ক্ষেত্রফল নির্ণয় করা দরকার, সেখানে

নীচের সূত্রটি প্রয়োগ করতে হবে। অবশ্য এই সূত্রটি স্কুলের অনেক শিক্ষার্থীর জানা। কিন্তু তারা হয়তো অনেকে জানে না যে, এই সূত্রটি আমাদের দেশের প্রাচীনকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গণিতাচার্য ব্রহ্মগুপ্ত আবিষ্কার করেছিলেন। যাই হোক, গণিতের ভাষায়, s = অর্ধপরিসীমা, a, b, ও c ত্রিভুজের তিনটি বাহু হলে,

ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল = $\sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$

ব্রহ্মগুপ্তের চতুর্ভুজ

বৃত্তে অন্তর্লিখিত চতুর্ভুজের ক্ষেত্রে ব্রহ্মগুপ্তের আবিষ্কার বিশেষ কৃতিত্বের দাবী রাখে। আমরা ভারতীয়রাও এই মহৎ আবিষ্কারের জন্য গর্ববোধ করি। বৃত্তে অন্তর্লিখিত চতুর্ভুজের চারিটি বাহু জানা থাকলেই তার ক্ষেত্রফল নির্ণয় করা যায়। আর সেই ক্ষেত্রফলের সঙ্গে আগের ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলের চমৎকার মিল আছে। সেইজন্য ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলের সূত্রটি জানা থাকলে খুব সহজে এই সূত্রটিও মনে রাখা যায়।

যদি s = অর্ধপরিসীমা, a, b, c, ও d চতুর্ভুজের চারটি বাহু হয়, তা হলে গণিতের ভাষায় সূত্রটি নিম্নরূপ :

চতুর্ভুজের ক্ষেত্রফল = $\sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)(s-d)}$।

বৃত্তে অন্তর্লিখিত চতুর্ভুজ সম্পর্কে ব্রহ্মগুপ্ত বলেন, বাহু, কর্ণ, লম্ব, ক্ষেত্রফল, এমনকি পরিলিখিত বৃত্তের ব্যাস পর্যন্ত মূলদরাশি দ্বারা প্রকাশ করা যায়। গভীর জ্ঞান ও স্বচ্ছ দৃষ্টি না থাকলে এরূপ কারুর পক্ষে বলা সম্ভব নয়।

আগেই বলেছি, কেবল স্বদেশে নয়, বিদেশেও তাঁর সম্মান ও শ্রদ্ধার আসন ছিল। বিদ্যানুরাগী খলিফা আল-মন-সূর (বিখ্যাত আরব সুলতান) তাইগ্রিস নদীর তীরে বাগদাদ নগরীতে জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষার ও চর্চার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর আমন্ত্রণে উজ্জয়িনীর এক গণিতজ্ঞ কঙ্ক 770 খ্রীস্টাব্দে বাগদাদে যান এবং ভারতীয়

জ্যোতির্বিজ্ঞান ও পাটীগণিত শিক্ষার ভার গ্রহণ করেন। সুলতানের আদেশে 796 অথবা 806 খ্রীস্টাব্দে মহম্মদ ইবন ইব্রাহিম অল্-ফজারী "ব্রহ্ম-স্ফুট-সিদ্ধান্ত" আরবী ভাষায় অনুবাদ করেন। তিনি বইটির আরবী নাম দেন "**সিন্দ-হিন্দ্**" বা "**হিন্দ্-সিন্দ্**"। আবার ব্রহ্মগুপ্তের আর একটি বই "খণ্ড-খাদ্যক"-ও আরবী ভাষায় অনুদিত হয়। এটির অনুবাদ করেন ইয়াকুব ইবন তারিখ্। খণ্ডখাদ্যকের আরবী নাম "**আরকন্দ**" বা "**অলর্কন্দ**"।

বররুচি

জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা বিচ্ছিন্ন বা বিক্ষিপ্তভাবে হয় না। তার একটা ধারাবাহিকতা থাকে—নানা ঘাত-প্রতিঘাত, উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা এগিয়ে চলে। পুরোনো ভাবনা-চিন্তার সংস্কার হয়, নতুন নতুন ভাবের প্রকাশ ঘটে। সভ্যতা এগিয়ে চলে, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সমৃদ্ধিশালী হয়। কাব্য-সাহিত্য-দর্শন-বিজ্ঞান ইত্যাদি সবার ক্ষেত্রেই এরকম দেখা যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, প্রাচীন ভারতের গণিতাচার্যদের সবার নাম, তাঁদের পরিচয়, এমন কি তাঁদের লেখা বইপত্র প্রায় কিছুই পাওয়া যায় না। সেইজন্য সব সময় ইতিহাসের ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করা যায় না। মাঝে মাঝে যেন অনেক ফাঁক থেকে গেছে। যেমন, শুল্বসূত্রের পর থেকে আর্যভটের সময় পর্যন্ত এই দীর্ঘ সময়ের মাঝখানে হয়তো অনেক গণিতাচার্য জন্মগ্রহণ করে থাকবেন, কিন্তু তাঁদের নাম, লিখিত গ্রন্থ ও বিশিষ্টতা সম্পর্কে আমরা কিছুই জানি না। অথচ, ভারতের গাণিতিক ঐতিহ্য তো অল্প সময়ে গড়ে ওঠেনি! বৈদিক যুগ থেকে তার সুপ্রাচীন ঐতিহ্য রয়েছে।

আচার্য আর্যভটের পূর্ববর্তী কোন গণিতজ্ঞের নাম এক নিঃশ্বাসে উচ্চারণ করা যাবে, এমন নাম খুঁজে পাওয়া মুস্কিল। দু-একটি বই-এর নাম করা যেতে পারে বটে, কিন্তু গণিতজ্ঞের নাম পাওয়া কঠিন। তবে সম্প্রতি একজন গণিতজ্ঞের নাম পাওয়া গেছে বলে অনুমান করা হচ্ছে যিনি আর্যভটের পূর্ববর্তী। তাঁর নাম **প্রথম বররুচি**। এঁর জন্মস্থান

কেরালা রাজ্যে। তাঁকে কেরালা রাজ্যে জ্যোতির্বিজ্ঞানচর্চার জনক বলা হয়। অনুমান করা হয়, তিনি খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর প্রথম দিকে জন্মগ্রহণ করে থা কবেন।

বররুচির লেখা বই তেমন পাওয়া যায়নি। মাত্র একখানি বই পাওয়া গেছে। এই বইটির নাম **'বররুচি—বাক্য'**। একে আবার 'চন্দ্র-বাক্য'ও বলা হয়। এতে মোট 248টি চন্দ্র-বাক্য রয়েছে। আর একটি বিষয়ে বররুচির বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। আমরা ইতিপূর্বে আর্যভটের বর্ণ-সংখ্যার কথা বলেছি। সংক্ষেপে বড় বড় সংখ্যা প্রকাশের এই রীতি বররুচিও প্রচলন করেন। তাঁর পদ্ধতির নাম **'কটপয়ধি'**। এই পদ্ধতি প্রচলন করে তিনি যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেন।

হরিদত্ত

বররুচি আচার্য আর্যভটের পুর্ববর্তী, আর হরিদত্ত আচার্য ব্রহ্মগুপ্তের পরবর্তী। গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিজ্ঞনী হিসাবে হরিদত্ত খ্যাতি অর্জন করেন। আর্যভট ও ব্রহ্মগুপ্তের মত তাঁর আবির্ভাব কাল নির্দিষ্ট করে বলা সম্ভব নয়। খুব সম্ভব, তিনি 650 থেকে 700 খ্রীস্টাব্দের মধ্যে কোন সময় জন্মগ্রহণ করে থাকবেন। বররুচির মত ইনিও কেরালা রাজ্যের অধিবাসী। এই রাজ্যের জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চার ইতিহাসে তাঁর নাম শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করা হয়।

জ্যোতির্বিজ্ঞানে ইনি একটি বিশেষ পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। এই পদ্ধতির নাম **'পরহিত পদ্ধতি'**। এটি আবিষ্কারের জন্য তিনি যথেষ্ট সম্মান ও খ্যাতি অর্জন করেন। 683 খ্রীষ্টাব্দে এই পদ্ধতি উদ্বোধনের মাধ্যমে প্রচলিত হয়। সেদিন ছিল কেরালা রাজ্যের 'মহা-মঘ' উৎসব। এছাড়াও তাঁর অন্যতম গবেষণা হচ্ছে শকাব্দ সংস্কার। এতেও তিনি প্রভূত যশ ও প্রতিষ্ঠা পান।

তাঁর রচিত দুটি গ্রন্থের কথা জানা যায়। একটির নাম **'গ্রহচার নিবন্ধন'** ও অপর গ্রন্থটির নাম **'মহামার্গনিবন্ধন'**। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থ 'মহামার্গনিবন্ধন' পাওয়া যায় না। যদি

কখনো পাওয়া যায়, তা হলে হয়তো হরিদত্ত সম্বন্ধে অনেক নতুন কথা জানা যাবে।

হরিদত্তের লেখা কোন সিদ্ধান্ত গ্রন্থ পাওয়া না গেলেও শঙ্কর-নারায়ণ নামে এক জ্যোতির্বিজ্ঞানী তাঁর লুপ্ত বই থেকে দু-তিনটি শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন। তবে হরিদত্ত নামে এক জ্যোতিষীর নাম পাওয়া যায়। জ্যোতিষ সম্পর্কে তাঁর দুটি বই-এর নাম হচ্ছে 'গণিতনাম মালা' ও 'সুবোধ জাতক'। তাঁর পিতার নাম শ্রীপতি।

হরিদত্ত নামে আর একজন দৈবজ্ঞের নাম জানা যায়। তিনি 'উপসর্গার্থদীপিকা' নামে একটি ফলিত জ্যোতিষের বই লেখেন।

আমাদের মনে হয়, শেষের দুই হরিদত্ত আমাদের আলোচিত হরিদত্ত নন। দ্বিতীয় জন হলেও হতে পারেন, কিন্তু তৃতীয় হরিদত্ত নৈব নৈব চ। কারণ, এঁর লিখিত বইটি বহু পরবর্তীকালের।

আচার্য লল্ল

ব্রহ্মগুপ্তের পর যে উল্লেখযোগ্য জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও গণিতজ্ঞের নাম করতে হয়, তিনি আচার্য লল্ল। তবে তিনি লল্লাচার্য নামে অধিক পরিচিত। অষ্টম শতাব্দীর পর অনেক জ্যোতির্বিদ ও গণিতজ্ঞ তাঁর নাম শ্রদ্ধার সহিত উল্লেখ করেছেন। উৎপল, মল্লিকাজুর্ন সূরী প্রমুখ তাঁর নাম করেছেন। মল্লিকাজুর্ন তো **শিষ্যধীবৃদ্ধিদ** এর টীকা-ভাষ্যও রচনা করেছেন। সর্বোপরি আচার্য ভাস্কর তাঁর **সিদ্ধান্ত শিরোমণি** গ্রন্থে লল্লের যেমন প্রশংসা করেছেন, তেমনি আবার তাঁর ভ্রান্ত ধারণা ও সূত্রের সমালোচনাও করেছেন। তিনিও লল্লের গ্রন্থের ভাষ্য রচনা করেছেন, তবে আংশিক মাত্র—সম্পূর্ণ নয়।

লল্লের পরিচয়

আচার্য লল্ল তাঁর 'শিষ্যধীবৃদ্ধিদ' গ্রন্থের 'গণিতাধ্যায়'-এর শেষের দিকে তাঁর বংশ-পরিচয় দিয়েছেন। তিনি বলেন, "তালধ্বজ সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পদ্মসদৃশ পদতলে অসংখ্য জ্ঞানী ব্যক্তি প্রণাম জানাতেন। সাম্ব তাঁর পুত্র। তিনি ছিলেন জনগণের

কাছে তেমন প্রিয় যেমন রাত্রিতে চন্দ্র কুমুদিনীর নিকট প্রিয়। তিনি ত্রিবিক্রম নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন।" লল্লের এই কাব্যরসমণ্ডিত বর্ণনা থেকে জানতে পারা যায় যে, তাঁর পিতামহের নাম তালধ্বজ। তিনি জ্ঞানী ছিলেন। সেইজন্য বিদ্বান ও জ্ঞানী ব্যক্তিরা তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতেন। লল্লের পিতা সাম্ব খুব জ্ঞানী ও বিদ্বান ছিলেন কিনা জানা যাচ্ছে না। তবে লল্লের বর্ণনা থেকে বোঝা যাচ্ছে, তিনি উদার ও মহৎ প্রকৃতির মানুষ ছিলেন।

লল্লের ভাষ্যকারের সংখ্যা কম নয়, আবার উত্তরসূরী গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিদরা যে সব ভাষ্য রচনা করেছেন তাতে লল্লের 'শিষ্যধীবৃদ্ধিদ' থেকে বহু উদ্ধৃতিও দিয়েছেন, কিন্তু তাঁর ভাষ্যকার ও গণিতজ্ঞরা কেউই তাঁর আবির্ভাব কাল সম্বন্ধে কিছু বলেননি। স্বয়ং লল্লও কোন গ্রন্থে তাঁর আবির্ভাব কাল সম্বন্ধে স্পষ্ট করে কিছু বলেননি। তবে পণ্ডিতরা তাঁর আবির্ভাব-কাল 'শিষ্যধীবৃদ্ধিদ'-র একটি গাণিতিক গণনাকে কেন্দ্র করে দিয়েছেন। তাঁরা বলেন, লল্লের আবির্ভাব ব্রহ্মগুপ্তের পর তাতে কোন সন্দেহ নেই। কারণ, তাঁর গ্রন্থে যে সব সূত্র আছে তা ব্রহ্মগুপ্তের অনুসরণে লিখিত। এমন কি, গ্রন্থের পরিকল্পনার সঙ্গেও 'ব্রহ্মস্ফুটসিদ্ধান্ত'-এর অনেক মিল আছে। পণ্ডিতদের সিদ্ধান্ত : লল্লের আবির্ভাব সম্ভবত 748 খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে অর্থাৎ অষ্টম শতাব্দীর প্রথম দিকে।

ভারতের কোন রাজ্যের অন্তর্গত ?

স্বাভাবিকভাবেই আমাদের জানতে ইচ্ছা করে লল্লাচার্য ভারতের কোন রাজ্যের অন্তর্গত। কিন্তু দুঃখের বিষয়,গ্রন্থকার নিজে এ-সম্পর্কে কিছুই বলেননি। গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞান এমনই সর্বজনীন বিষয় যে, এ-সব শাস্ত্রের আলোচনায় দেশ-কালের উল্লেখ নিতান্ত গৌণ হয়ে পড়ে। তাই প্রাচীন গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিদদের সম্পর্কে প্রায় কিছু জানতে পারা যায় না। তা হলেও পণ্ডিত ও সমালোচকরা সূত্র খোঁজার চেষ্টা করেন যাতে কোন ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এইরকম একটি সূত্র তাঁর 'শিষ্যধীবৃদ্ধিদ' গ্রন্থের নবম অধ্যায়ের উনিশতম শ্লোকে পাওয়া গেছে। এখানে প্রাসঙ্গিক

অংশের উল্লেখ করা হলো : "যখন ব্যাস দ্বারা সমদ্বিখণ্ডিত চন্দ্রের অর্ধাংশ আলোকিত হয় তখন চন্দ্র-সৌন্দর্য লাটদেশের নারীর ললাটতটের ন্যায় সুষমামণ্ডিত হয়।" তা ছাড়া তাঁর 'রত্ন কোষ' জ্যোতিষ গ্রন্থের 'ঋতুচর্চা'-য় বলেছেন,—'ললাটে লাটনিনাম্ লুঠিতম্ অলকন্ তাণ্ডবয়তি'—লাটদেশের রমণীর ললাটে কেশগুচ্ছ তাণ্ডব নৃত্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

আমরা আগেই মল্লিকার্জুনের নাম উল্লেখ করেছি। তিনি 'শিষ্যধীবৃদ্ধিদ'-এর একজন প্রধান ভাষ্যকার। তাঁর ভাষ্য বা ব্যাখ্যায় দেখা যায় যে, 'লাটী' বলতে এখানে লল্ল তাঁর নিজের দেশ বা রাজ্যের নারীদের সৌন্দর্য সম্পর্কে একটু পক্ষপাত দেখিয়েছেন। মল্লিকার্জুনের এই মন্তব্য বিনা প্রমাণে হয়েছে বলে মনে হয় না। দ্বাদশ শতাব্দীর এই গণিতজ্ঞ অবহিত হয়ে এরূপ মন্তব্য করেছেন বলে ধরা চলে, যদিও তিনি লল্লের প্রায় চারশ' বছর পরে আবির্ভূত হন। তা ছাড়া 'লাট' দাক্ষিণাত্যে বহুল পরিচিত ছিল, এবং এই অঞ্চলের বিভিন্ন অংশে এই দেশের উল্লেখ রয়েছে। এই দুটি প্রমাণের ভিত্তিতে বলা চলে যে, লল্ল গুজরাটের দক্ষিণাংশে অবস্থিত লাটদেশের অধিবাসী ছিলেন।

রচনাবলী

কমপক্ষে পাঁচখানি গ্রন্থ লিখেছিলেন আচার্য লল্ল। কিন্তু তাঁর সব গ্রন্থ এখন আর পাওয়া যায় না। যে গ্রন্থটি পাওয়া যায়, তার নাম **'শিষ্যধীবৃদ্ধিদ'**। সত্যি কথা বলতে কি, এইটি তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ।

'শিষ্যধীবৃদ্ধিদ' এই শিরোনামের অর্থ কি? এর অর্থ এই যে, এতে জ্যোতির্বিজ্ঞানের ছাত্রদের জ্ঞান বৃদ্ধি পাবে। তিনি তাঁর গ্রন্থের প্রথমেই বলেছেন, "লল্ল আকাশস্থ অধিবাসীদের গতি বর্ণনা করছেন যা প্রকৃত কঠিন। এই বিষয়টি আচার্য আর্যভট বর্ণনা করেছেন। লল্ল আশা করেন যে, তাঁর গ্রন্থ ছাত্রদের জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক জ্ঞান বৃদ্ধি করবে।" তিনি বইটি লেখার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেছেন, "আর্যভটের বহু শিষ্য তাঁর গ্রন্থ পড়েছেন ও তন্ত্রাদি রচনা করেছেন। কিন্তু তাঁদের রচনা সম্পূর্ণ নয়। সেইজন্য লল্ল সম্পূর্ণ ও শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে গ্রন্থ রচনা করার

পরিকল্পনা করেছেন।” তিনি স্বীকার করেছেন তাঁর গ্রন্থ আর্যভটের অনুসারী।

‘শিষ্যধীবৃদ্ধিদ’-র গোলাধ্যায়ের দ্বিতীয় অংশের ঐতিহাসিক মূল্য যথেষ্ট। এই অংশে অষ্টম শতাব্দীর ভারতের ভৌগলিক বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে : সে-সময়ে জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কে যে-সব কুসংস্কার ও ভ্রান্ত ধারণা প্রচলিত ছিল, তার বর্ণনা যেমন আছে, তেমনি আবার প্রমণাসহ খণ্ডনও করেছেন। ‘জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক যন্ত্র’ অধ্যায়ে লেখক কমপক্ষে বার রকমের যন্ত্রের বর্ণনা করেছেন। যেমন,—পারদ-তৈল-জল দ্বারা স্বয়ংক্রিয় ঘূর্ণন যন্ত্র, গোল-যন্ত্র, স্বয়ংক্রিয় ঘূর্ণন চক্র, স্বয়ংক্রিয় ঘূর্ণন গোলক, চক্র-যন্ত্র, ধনুর-যন্ত্র, কর্তরী-যন্ত্র, কপাল-যন্ত্র, শঙ্কু-যন্ত্র, ঘটী-যন্ত্র, শলাকা-যন্ত্র, শকট-যন্ত্র, ইত্যাদি।

লল্লাচার্যের জ্যোতিষ সংক্রান্ত বইটির নাম ‘রত্নকোষ’। এটির পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে। এতে তিথি, করণ, সপ্তাহ, মুহূর্ত, নক্ষত্র সম্পর্কে আলোচনা আছে ; গৃহ-নির্মাণ, মন্দির-নির্মাণ, মূর্তি-স্থাপন, উদ্ভিদ-রোপণ ইত্যাদির বর্ণনা আছে ; নর-নারীর শুভাশুভের লক্ষণও বর্ণিত হয়েছে। এতে নারদ, মাণ্ডব্য, বরাহমিহির প্রমুখের অনুসরণ দেখা যায়। তিনি জ্যোতিষ ও জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কে দুটি গ্রন্থ রচনা করে থাকবেন,—এমন ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

লল্ল গণিত সম্পর্কীয় কোন গ্রন্থও রচনা করে থাকবেন। অবশ্য এ-রকম কোন গ্রন্থের আবিষ্কার এখনো হয়নি। ভাস্করাচার্য তাঁর গ্রন্থে লল্লের ‘গণিত’ নামে একটি গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন। তাতে নাকি গোলকের তলের ক্ষেত্রফল ছিল,—$2\pi r. \pi r^2$। অবশ্য ভাস্করাচার্য সূত্রটি ভুল বলে উল্লেখ করেছেন।

আর্যভট ও ব্রহ্মগুপ্তও পৃথক গণিত গ্রন্থ রচনা করেননি। কিন্তু তাঁরা জ্যোতির্বিজ্ঞান আলোচনা প্রসঙ্গে পৃথক অধ্যায়ে গণিতের নিয়ম ও সূত্র নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছেন। লল্ল ‘শিষ্যধীবৃদ্ধিদ’-এ গণিত নিয়ে পৃথক আলোচনা করেননি।

জনপ্রিয়তা ও ঐতিহাসিক গুরুত্ব

জনপ্রিয় গ্রন্থকার হিসাবে লল্লের খ্যাতি ছিল। তাঁর গ্রন্থ থেকে পরবর্তী জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও গণিতাচার্যরা বহু শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন। 'আর্যভটীয়' গ্রন্থের ভাষ্যে সূর্যদেব যদ্ধা ও পরমেশ্বর তাঁর উল্লেখ করেছেন ; যল্লয় ও রামকৃষ্ণ আরাধ্যের সূর্য-সিদ্ধান্তের ভাষ্যে তাঁর নাম দেখা যায়। মুণীশ্বর ও লক্ষ্মীদাস তাঁদের 'সিদ্ধান্ত শিরোমণি'র ভাষ্যে লল্লের গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন। এ ছাড়া গঙ্গাধর, বীরসিংহ, গোপীনাথ, নৃসিংহ, চণ্ডেশ্বর, ভূধর প্রমুখ লল্লের শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন।

উত্তরসূরীদের কাছে লল্লের যে সম্মান ও প্রতিপত্তি, তা কোন রকমেই উপেক্ষা করা যায় না। বস্তুত, ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞান ও জ্যোতিষের ইতিহাসে তাঁর স্থান নির্দিষ্ট। কিন্তু তা সত্ত্বেও একথা স্বীকার করতে হবে, আর্যভট ও ব্রহ্মগুপ্তের মত লল্লের মৌলিক কোন অবদান নেই। তিনি আর্যভট, প্রথম ভাস্কর, ব্রহ্মগুপ্তের নিকট বহুল পরিমাণে ঋণী, আবার শ্রীপতি ও ভাস্করাচার্যও তাঁর কাছে কম ঋণী নন। তা ছাড়া তাঁর গ্রন্থের পরিকল্পনা ও বিষয় বিন্যাস খুবই সুচিন্তিত ও শৃঙ্খলিত। সম্ভবত এইজন্যই তাঁর সবিশেষ জনপ্রিয়তা। ইউক্লিডের জনপ্রিয়তা কিছুটা এই কারণেই। ব্রহ্মগুপ্ত ও ভাস্করাচার্যের মাঝে অবস্থান করছেন লল্ল। তাই তাঁর ঐতিহাসিকতা অতীব মূল্যবান বলে বিবেচিত হওয়ার দাবী রাখে।

আচার্য শ্রীধর

প্রাচীন ভারতীয় গণিতাচার্যরা প্রধানত জ্যোতির্বিজ্ঞানী। কিন্তু গণিতজ্ঞান ছাড়া জ্যোতির্বিজ্ঞানী হওয়া সম্ভব হয়। আর্যভট, ব্রহ্মগুপ্ত প্রমুখের গ্রন্থে জ্যোতির্বিজ্ঞানের আলোচনাই বেশী, বিশুদ্ধ গাণিতিক আলোচনা কম। বস্তুত, বিশুদ্ধ গণিত নিয়ে ভারতীয় গণিতাচার্যরা কমই চিন্তা করেছেন। কিন্তু আচার্য শ্রীধর এ-বিষয়ে ব্যতিক্রম। তাঁর গ্রন্থে জ্যোতির্বিজ্ঞানের আলোচনা নেই। তিনি বিশুদ্ধ গণিত নিয়ে আলোচনা করেছেন।

অবদান

আচার্য শ্রীধরের মোট তিনখানি গ্রন্থের নাম জানতে পারা যায়। এই তিনটি গ্রন্থ হলো 'পাটীগণিত', 'বীজগণিত' ও 'পাটীগণিত সার'। পাটীগণিত বইটি ছিল সম্ভবত খুবই বড়। এবং এতে নানা বিষয়ের আলোচনা ছিল। কিন্তু বর্তমানে এটি পাওয়া যায় না। তবে এই গ্রন্থ থেকে সার সঙ্কলন করে তিনি 'পাটীগণিত সার' লেখেন। খুব সম্ভব, এই বইটি তরুণ শিক্ষার্থীর উপযোগী করে লেখা হয়েছিল। এটিই শ্রীধরের একমাত্র গ্রন্থ যা বর্তমানে পাওয়া যায়। এই বইটির অন্য একটি নামও আছে— 'ত্রশতী' বা 'ত্রিশতিকা।' এতে তিনশ' শ্লোক রয়েছে বলে এরূপ নামকরণ করা হয়েছে বলা হয়।

আমরা বর্তমানে একটি মাত্র পদ্ধতিতেই গুণ করি। কিন্তু প্রাচীন ভারতে গুণের অনেক পদ্ধতি ছিল। যেমন, কয়েকটির নাম : 'গোমূত্রিকা পদ্ধতি', 'ইষ্ট পদ্ধতি', 'আংশিক গুণন পদ্ধতি, 'কপাট-সন্ধি পদ্ধতি, 'স্থান-খণ্ড পদ্ধতি', ইত্যাদি। শ্রীধরাচার্যের 'ত্রিশতিকা'-য় 'কপাট-সন্ধি' পদ্ধতির বিস্তারিত আলোচনা দেখা যায়।

শ্রীধরাচার্যের 'বীজগণিত' গ্রন্থটি বহুদিন অবলুপ্ত। কিন্তু তিনি যে এটি লিখেছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই। কারণ ভাস্করাচার্য তাঁর 'সিদ্ধান্ত শিরোমনি' গ্রন্থে 'বীজগণিত' বই থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন। এমন কি, শ্রীধরাচার্যের নিকট তাঁর ঋণও স্বীকার করেছেন।

দ্বিঘাত সমীকরণ সমাধান পদ্ধতি বিষয়ে তাঁর সূত্রটি ছাত্র-ছাত্রীদের পরিচিত। আগ্রহ নিরসনের জন্য এখানে সূত্রটি ও তার বিশ্লেষণ আধুনিক গাণিতিক ভাষায় দেওয়া হলো :

সূত্র : "সমীকরণের উভয়পক্ষকে বর্গ-অজ্ঞাত রাশির সহগের চার গুণ দিয়ে গুণ কর ও উভয়পক্ষে অজ্ঞাতরাশির সহগের বর্গ যোগ করে বর্গমূল নির্ণয় কর।"

ধরা যাক, সমীকরণটি $ax^2 + bx = c$

বা, $4a \times ax^2 \times 4abx = 4a \times c$

বা, $4a^2x^2 + 4abx = 4ac$

বা, $4a^2x^2 + 4abx + b^2 = 4ac + b^2$

বা, $(2ax + b)^2 = 4ac + b^2$

বা, $2ax + b = \pm\sqrt{4ac + b^2}$

বা, $2ax = -b \pm \sqrt{4ac + b^2}$

বা, $x = \dfrac{-b \pm \sqrt{b^2 + 4ac}}{2a}$

পরিচয়

শ্রীধর নামে একাধিক বিখ্যাত ব্যক্তির নাম পাওয়া যায়। যাঁর কথা আমরা আলোচনা করছি, তিনি যে প্রখ্যাত গণিতজ্ঞ তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু শ্রীধর নামে একজন বিখ্যাত দার্শনিকও আছেন। তাঁর গ্রন্থটির নাম 'ন্যায়কন্দলী'। কেউ কেউ মনে করেন, গণিতজ্ঞ শ্রীধর ও দার্শনিক শ্রীধর একই ব্যক্তি। এই দার্শনিক শ্রীধর বাঙালী। তাঁর জন্মস্থান বিখ্যাত ভূরস্থট গ্রাম যেখানে রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র জন্মেছিলেন, কিন্তু নানা কারণে 'ন্যায়কন্দলী'-কার শ্রীধর গণিতজ্ঞ শ্রীধর নন। গণিতজ্ঞ শ্রীধর নিঃসন্দেহে তাঁর পূর্ববর্তী। শ্রীধরাচার্য ঠিক কবে জন্মেছিলেন নিশ্চিত করে বলা যায় না। কারণ, তাঁর গ্রন্থে তেমন কোন সাল-তারিখের উল্লেখ দেখা যায় না। তবে অন্যসব কারণ বিশ্লেষণ করে পণ্ডিতরা বলেন, তিনি সম্ভবত 750 থেকে 991 খ্রীস্টাব্দের মধ্যে কোন সময় জন্মগ্রহণ করে থাকবেন।

শ্রীধর বিশেষণ

গণিতজ্ঞ হিসাবে শ্রীধরাচার্যের খ্যাতি ভারতের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর গ্রন্থের একটি শ্লোকে লেখা আছে,—"উত্তরে হিমালয় হইতে মলয় পর্বত পর্যন্ত এবং পূর্ব ও পশ্চিম সমুদ্রের মধ্যে শ্রীধর ব্যতীত অপর কোন গণক নাই।" গণিতজ্ঞ হিসাবে এমন সর্বভারতীয় খ্যাতি কম গণিতজ্ঞই অর্জন করতে পেরেছিলেন। শুধু তাই নয়, তাঁর নামই বিশেষণরূপে প্রয়োগ করে অনেকে গর্ববোধ করতেন। এই খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা

ভাস্করাচার্যের মত উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের আবির্ভাবের পরও কিভাবে সম্ভব হয়েছিল, তা ভাবলে অবাক হতে হয়। অনেক গণিতজ্ঞ শ্রীধর নাম বিশেষণরূপে গ্রহণ করে সম্মানিত বোধ করতেন।

বৃত্তের পরিধি ও ব্যাসের অনুপাতকে 'পাই (π) বলে। আর্যভট π-এর মান নির্ণয় করেছিলেন। শ্রীধরাচার্যের 'ত্রিশতিকা'-য় পাই-এর স্থুল মান দেওয়া আছে $\sqrt{10}$। এই মান ব্যবহারিক কার্যে প্রয়োগ করা যেতে পারে। কিন্তু শ্রীধরাচার্য π-এর সূক্ষ্ম মান জানতেন, এবং নির্ণয়ও করেছিলেন। তাঁর মতে π-এর অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম মান,

$$\pi = \frac{3927}{1250}$$

বলা বাহুল্য, প্রাচীন ভারতে দশমিকের ব্যবহার ছিল না। তাই তিনি ভগ্নাংশে পাই (π)-এর মান দিয়েছেন। এই কাজটি সামান্য নয়, প্রকৃত গাণিতিক প্রতিভা ছাড়া সম্ভব নয়। সেইজন্যেই সম্ভবত সে-যুগের বহু পরেও গণিতজ্ঞরা 'শ্রীধর' বিশেষণ লাভের জন্য আকাঙ্খা পোষণ করতেন।

আচার্য মহাবীর

শ্রীধরাচার্যের পর মহাবীরাচার্য একমাত্র গণিতজ্ঞ যিনি প্রকৃতপক্ষে বিশুদ্ধ গণিত ছাড়া অন্য কোন বিষয় তাঁর গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন নি। শ্রীধরের গণিতের সহিত তাঁর গ্রন্থের বিষয়ের অনেক মিল রয়েছে। কিন্তু তিনি শ্রীধরের গণিত থেকে সাহায্য গ্রহণ করেছিলেন কিনা নিশ্চিত করে বলা যায় না। যদি তিনি শ্রীধরের বই-এর সাহায্য নিয়ে নাও থাকেন, তা হলে অন্তত উভয়েই একই উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছেন। কিন্তু তেমন কোন বই-এর সন্ধান আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।

মহাবীরের রাজসম্মান

ভারতের কোন কোন রাজা যে বিদ্যোৎসাহী ছিলেন, তা ইতিহাস থেকে জানা যায়। বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভার কথা চলে আসছে।

কালিদাস ছিলেন সেই সভার শ্রেষ্ঠ রত্ন। তা ছাড়া জ্যোতিষী বরাহ-মিহিরও নাকি নবরত্নের অন্যতম ছিলেন বলে কিংবদন্তী রয়েছে। ভারতের রাজদরবারে পণ্ডিত, কবি, সাহিত্যিকদের সমাবেশ একরকম প্রথা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। শ্রীহর্ষ, লক্ষ্মণ সেন, এমন কি আকবরের সভাতেও পণ্ডিত ও কবিদের সমাদর ছিল।

মহাবীরও রাজদরবারে সম্মান পেতেন। সেই সময় দক্ষিণ ভারতে রাজা অমোঘবর্ষ নৃপতুঙ্গের রাজত্বকাল (814-877)। তিনি যে মহাবীরের গাণিতিক প্রতিভায় মুগ্ধ ছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। হয়তো কোন কোন সময় পুরস্কৃত করেও থাকবেন। কিন্তু জৈন ধর্মাবলম্বী এই গণিতজ্ঞ পার্থিব সম্মান ও পুরস্কার গ্রহণ করে গর্ববোধ করতেন কিনা সন্দেহ। কারণ, জৈন ধর্মে পার্থিব লাভালাভের স্থান নেই, এবং তিনি বিমূর্ত গণিতের চিন্তায় মগ্ন থাকতেন। অনুমান করা যায়, রাজা অমোঘবর্ষ নৃপতুঙ্গের সভার শ্রেষ্ঠ রত্ন ছিলেন তিনি।

নবম শতাব্দীর ভারতের শ্রেষ্ঠ গণিতজ্ঞ মহাবীরাচার্য। মাত্র পঞ্চাশ-ষাট বছর আগে তাঁর লেখা একমাত্র গ্রন্থ 'গণিত-সার সংগ্রহ' আবিষ্কৃত হয়। দক্ষিণ ভারত ছাড়া ভারতের আর কোথাও এই গ্রন্থটির প্রচলন ছিল বলে জানা যায় না। কানাড়ী ও তেলেগু ভাষায় এই গ্রন্থের অনুবাদ ও ভাষ্য পাওয়া যায়।

গ্রন্থ পরিচয়

805 খৃষ্টাব্দে মহাবীর 'গণিত-সার-সংগ্রহ' রচনা করেন। নাম থেকে মনে হয় এতে গণিতের সার সংগ্রহ করা হয়েছে। অর্থাৎ এটি একটি সঙ্কলন গ্রন্থ। এতে আছে পূর্ববর্তী গণিতাচার্যদের আবিষ্কৃত নিয়ম-সূত্রের আলোচনা, আবার কোন কোন নিয়ম-সূত্রের সংস্কারও করেছেন তিনি।

'গণিত-সার-সংগ্রহ' মোট নয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত। এখানে যোগ-বিয়োগের আলোচনা নেই। খুব সম্ভব এই প্রক্রিয়া দুটি অতি প্রাথমিক পর্যায়ের বলে আলোচনায় স্থান দেননি। এতে বর্গ ও বর্গমূল নির্ণয়,

ঘন ও ঘনমূল নির্ণয়, ভগ্নাংশ—বিশেষ করে একক-ভগ্নাংশ, সমান্তর ও গুণোত্তর শ্রেণীর যোগফল নির্ণয় ইত্যাদির আলোচনা আছে। আর আছে ত্রৈরাশিক, বীজগণিতের দ্বিঘাত ও অনির্ণেয় সমীকরণ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ।

ভারতীয় গণিতাচার্যদের এক মহৎ আবিষ্কার ত্রৈরাশিক। নানারকম অঙ্কে এর প্রয়োগ করা যায়। যে পদ্ধতিতে তিনটি রাশির মধ্যে দুটি জানা থাকলে তৃতীয়টি নির্ণয় করা যায়, তারই নাম ত্রৈরাশিক। আগেই বলেছি, ভারতীয় সংখ্যা, দশমিক পদ্ধতি ইত্যাদি আরব পণ্ডিতদের দ্বারা ইউরোপে প্রচারিত ও প্রচলিত হয়। এইভাবে পাশ্চাত্য জগৎ ভারতীয় গণিতের সংস্পর্শে আসে। পাশ্চাত্যে ত্রৈরাশিক এমন জনপ্রিয় হয় এবং এর সারবত্তায় পাশ্চাত্য গণিতজ্ঞরা এমন মুগ্ধ হন যে, তারাই নিয়মটির নামকরণ করেন স্বর্ণ-নিয়ম—Golden Rule।

বররুচি ও আর্যভট যেমন বর্ণমালার সাহায্যে সংখ্যা প্রকাশ করার রীতি প্রবর্তন করেন, তেমনি মহাবীরও বর্ণমালার সাহায্যে সংখ্যা প্রকাশ করেন। তবে তাঁর মৌলিকতা বেশী নেই, তিনি পূর্ববর্তীদের অনুসরণ করেছেন বলে মনে হয়।

পাটীগণিত কত মজার

'গণিত-সার-সংগ্রহ' পাটীগণিত ও বীজগণিত অঙ্কের আকর। কত সুন্দর ও মজার অঙ্ক আছে এখানে। এইসব অঙ্ক পড়লেই যেন কষতে ইচ্ছে হয়। তাছাড়া আরো নানা মজা আছে সংখ্যা নিয়ে।

ফুল দিয়ে মালা গাঁথা হয়। ফুল হতে পারে নানা ধরনের, নানা রঙের, আবার একরকমের ফুলও হতে পারে। কিন্তু সংখ্যা দিয়ে কি মালা গাঁথা যায়? অথচ সংখ্যা দিয়েও চমৎকার মালা গাঁথা যায়। এদের **'মাল্য গুণন'** বলে। এই সংখ্যা বিচিত্র ধরনের।

গুণ করার পর ডানদিক বা বামদিক যেদিক থেকেই দেখা বা পড়া যাক না কেন সংখ্যার অঙ্কগুলি একই থাকবে—কোন পরিবর্তন দেখা যাবে না। ইংরেজীতে এরকম সংখ্যার নাম **'প্যালিনড্রোমিক সংখ্যা'**।

একটিমাত্র অঙ্ক দিয়ে প্যালিনড্রোমিক সংখ্যা হতে পারে না। দু-অঙ্কের প্যালিনড্রোমিক সংখ্যার সবচেয়ে ছোটটি 11 এবং তার পরের সংখ্যাগুলি 11-এর গুণিতক। মোট 9টি হতে পারে। তিন অঙ্কের সংখ্যা কিন্তু কম নয়—90টি। সবচেয়ে ছোটটি হলো 101। যাই হোক, এই ধরনের সংখ্যা নিয়ে বেশ মজা আছে। আচার্য মহাবীরের গ্রন্থ থেকে এরকম কয়েকটি সংখ্যা দেওয়া হলো :

(1) $139 \times 109 = 15151$

(2) $12345678 \times 9 = 111, 111, 111$

(3) $152207 \times 73 = 11, 111, 111$

(4) $27994681 \times 441 = 123456\ 54321$

(5) $14287143 \times 7 = 1000\ 1\ 000\ 1$

(6) $333\ 333\ 666667 \times 33 = 11000011000011$

(7) $142857143 \times 7 = 10000\ 00001$

(8) $11011011 \times 91 = 1002002001$

আমরা সবাই জানি, ভগ্নাংশের যোগ-বিয়োগ করতে গেলে ল. সা. গু. করতে হয়। এখন আর আমাদের এ নিয়ে খুব বেশী চিন্তা-ভাবনা করতে হয় না। কিন্তু এক সময় বিশ্বের বড় বড় গণিতজ্ঞরা ভগ্নাংশের যোগ-বিয়োগ করতে হিমসিম খেতেন ভাবলে অবাক লাগে। তাঁরা যে অঙ্ক বুঝতেন না বা কষতে পারতেন না, তা নয়। আসলে তখন ভগ্নাংশের যোগ-বিয়োগ করার সহজ পদ্ধতি ছিল না। ফলে, জটিল পদ্ধতিতে এই কাজ করতে হতো। সেই জটিলতার হাত থেকে রেহাই দিলেন আচার্য মহাবীর। তিনি প্রথম ল. সা. গু. পদ্ধতিতে ভগ্নাংশের যোগ-বিয়োগ প্রক্রিয়া সহজ করে তুললেন। ল. সা গু. পদ্ধতি আবিষ্কৃত হলো। মহাবীরের প্রতিভা বিশ্বগণিতের ইতিহাসে স্বীকৃত হলো।

ল. সা. গু. নামটি অবশ্য তাঁর আবিষ্কার নয়। তাঁর দেওয়া নাম 'নিরুদ্ধ'। অর্থাৎ নিরুদ্ধ মানে ল. সা. গু.। ভৌত বিজ্ঞান পড়তে গেলে 'বায়ু নিরুদ্ধ' কথাটির সঙ্গে পরিচিত হতে হয়। এখানে নিরুদ্ধ

সেই অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। সত্যিই খণ্ড অংশগুলি বা ভাঙা অংশগুলি কায়দা করতে হলে—একত্রিত করতে হলে নিরুদ্ধ করতেই হয়। খুচরো পয়সা রাখতে যেমন মানিব্যাগ নিরুদ্ধ করতে হয়।

নীচের ক্লাস থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের এক ধরনের অঙ্ক কষতে হয়। এই ধরনের অঙ্কে যোগের জায়গায় বিয়োগ, বিয়োগের জায়গায় যোগ, গুণের জায়গায় ভাগ, আর ভাগের জায়গায় গুণ করতে হয়। অর্থাৎ শেষ থেকে শুরু করে বিপরীত প্রক্রিয়া অবলম্বন করতে হয়। এরকম অঙ্ক আমাদের দেশে অনেক কাল আগে থেকে চলে আসছে। আর্যভট, ব্রহ্মগুপ্ত প্রমুখ এই ধরনের অঙ্কের নিয়ম নিয়ে আলোচনা করেছেন। মহাবীরের 'গণিত-সার-সংগ্রহ' থেকে একটি উদাহরণ দেওয়া যাক :

উদাহরণ : কোন সংখ্যাকে 7 দ্বারা ভাগ 3 দ্বারা গুণ ও বর্গ করার পর 5 যোগ করে $\frac{3}{5}$ দিয়ে ভাগ ও অর্ধ করে বর্গমূল করলে 5 হয়?

[উঃ—$11\frac{2}{3}$]

বীজগণিতের সামান্য মজা

পাটীগণিতের সীমা ছোট—বীজগণিতের সীমা বড়—অনেক বড়। পাটীগণিতের ধারণাগুলি বীজগণিতে ব্যাপক অর্থে প্রয়োগ করা হয়। পাটীগণিতের সংখ্যা বীজগণিতে রয়েছে, আবার নতুন অনেক রকম সংখ্যা রয়েছে। গণিতে বীজগণিত অনেক সুবিধা এনে দিয়েছে। কিন্তু হলে কি হয়? অনেকের আবার এই বিষয়টি ভাল লাগে না। একজনকে বলতে শুনেছি, অ্যালজেব্রা তো নয়, যেন আলকাতরা। x, y, z ইত্যাদি তাদের কাছে বিভীষিকাস্বরূপ। কিন্তু আচার্য মহাবীর বীজগণিত যাতে সবার ভাল লাগে, তার জন্য সুন্দর সুন্দর অঙ্ক উদ্ভাবন করেছেন। এ সব পড়তেও ভাল লাগে, আবার মনকে খুবই আকর্ষণ করে। এখানে তাঁর বই থেকে একটিমাত্র উদাহরণ তুলে ধরা হলো :

উদাহরণঃ এক ব্যক্তি বাড়ীতে কিছু আম কিনে আনল। বড়ছেলে একটি আম নিয়ে বাকী আমের অর্ধেক নিল; ছোট ছেলেও ঠিক তাই করল। বাকী আম বাড়ীর অন্যান্যরা নিল। ওই ব্যক্তি কতগুলি আম এনেছিল বাড়ীতে?

অঙ্কটির ভাষা সহজ, আর বেশ মজারও বটে। কিন্তু এটি কষা তত সহজ নয়। বীজগণিতের সমীকরণঘটিত সমস্যা সমাধান স্কুলের সপ্তম মান থেকেই করতে হয়। কিন্তু এই অঙ্কটি সমীকরণঘটিত নয়—অণির্ণেয় সমীকরণঘটিত। আমরা আর্যভটের আলোচনার পর থেকে অনেকবার অনির্ণেয় সমীকরণের কথা বলেছি। 'অনির্ণেয়' শব্দ থেকে বোঝা যাচ্ছে, সমীকরণঘটিত সমস্যার মত এর কোন নির্দিষ্ট সমাধান নেই। অনির্ণেয় সমীকরণের সমাধান করলে অনেক বীজ পাওয়া যায়—নির্দিষ্ট বীজ পাওয়া যায় না।

অঙ্কের শর্ত থেকে অনির্ণেয় সমীকরণটির আকার হবে—$y = 4x + 3$ এখানে, y = মোট আমের সংখ্যা, আর x = অন্যান্যদের আমের সংখ্যা। ডানদিকে x-এর মান যা ইচ্ছে তাই (যাচ্ছেতাই নয় কিন্তু!) ধরলে y-এর অসংখ্য মান পাওয়া যায়। যেমন, $x = 1, 2, 3....$ ধরলে $y = 7, 11, 15....$ হবে।

পরিমিতি ও জ্যামিতি নিয়ে দু-চার কথা

আচার্য মহাবীর গোলক ও চতুস্তলকের দুটি করে সূত্র দিয়েছেন। একটি স্থূল ও অপরটি সূক্ষ্ম। স্থূল সূত্রটি ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হতো, আর সূক্ষ্মটি গাণিতিক গণনায়।

বর্তমানে গোলক স্কুলের সিলেবাসে আছে। তাই ছাত্র-ছাত্রীদের গোলকের বক্রতলের ক্ষেত্রফল ও আয়তন দুই-ই জানা। এখানে মহাবীরের বই থেকে গোলকের আয়তনের সূত্রটি দেওয়া হলোঃ

স্থূল সূত্রঃ

1) $^3r\frac{9}{2} = \frac{3}{2}\pi r^3$

এখানে $\pi = 3$

সূক্ষ্ম সূত্র :

$$2) \quad r^3 \frac{9}{2} \cdot \frac{9}{10} = \frac{81}{20} r^3$$

এখানে $\pi = \sqrt{10}$,

মহাবীর সূক্ষ্ম সূত্রের বেলায় π-এর মান $\sqrt{10}$ ধরেছেন বলে সূক্ষ্ম আয়তন $= 1{\cdot}3\pi r^3$। এই আয়তন আধুনিক আয়তন $\frac{4}{3}\pi r^3$-এর প্রায় কাছাকাছি।

ত্রিভুজ নিয়ে মহাবীরের আলোচনা বিস্তৃততর। তিনি সর্বপ্রথম ত্রিভুজে অন্তর্লিখিত বৃত্ত ও ব্যাসের কথা বলেন। নানা ধরনের ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলের সূত্র তাঁর গ্রন্থে দেখা যায়। যেমন,—

1) ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল $= \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$

2) ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল $= \frac{1}{2} \times$ ভূমি $\times$ উচ্চতা

3) সমবাহু ত্রিভুজের স্থূল ক্ষেত্রফল $= \frac{a}{2} \times a = \frac{a^2}{2}$

4) ওই ত্রিভুজের সূক্ষ্ম ক্ষেত্রফল $= \frac{\sqrt{3}}{4} a^2$ [$a =$ বাহু]

এ ছাড়া চতুর্ভুজ, বৃত্তে অন্তর্লিখিত চতুর্ভুজ, ট্রাপিজিয়াম ইত্যাদির ক্ষেত্রফলের সূত্রও দিয়েছেন মহাবীর। প্রাচীন ভারতীয় গণিতের তিন মহারথী হলেন আর্যভট, ব্রহ্মগুপ্ত ও ভাস্করাচার্য। এঁদের সঙ্গে কারুর তুলনা চলে না সত্য, কিন্তু মহাবীর নবম শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ গণিতজ্ঞ এবং দু-একটি ক্ষেত্রে নতুন পথের প্রদর্শক।

জৈনদের গণিতচর্চা নিয়ে

অতীত ভারতের গণিতচর্চায় জৈনদের বিশিষ্ট অবদান শ্রদ্ধার সহিত স্মরণযোগ্য। ভদ্রবাহু ও উমাস্বাতী প্রকৃত গণিতজ্ঞ ছিলেন না সত্য, কিন্তু তাঁদের গণিতজ্ঞান কম ছিল না। মহাবীর ভারতীয় গণিতজ্ঞদের মধ্যে অন্যতম, সন্দেহ নেই। কিন্তু অধিকাংশ জৈন গণিতজ্ঞরা মহাবীরের পর আবির্ভূত হন।

মহাবীরের পূর্ববর্তী একজন গণিতজ্ঞের নাম বীরসেন। ইনি রাষ্ট্রকূট বংশীয় রাজা জগতুঙ্গের সমসাময়িক। তাঁর গণিত বিষয়ক টীকার নাম 'ধবলা টীকা'। গ্রন্থটি অষ্টম শতাব্দীতে লেখা। এতে গণিত সম্পর্কে নানা আলোচনা দেখা যায়।

নেমিচন্দ্র আর এক জৈন গণিতজ্ঞের নাম। তিনি দুটি বই লেখেন : 'ত্রিলোকসার' ও 'গোম্মতসার'। এতে প্রাচীন জৈন গণিতের আলোচনা রয়েছে।

বীরসেন π-এর মান নির্ণয়ে নতুন একটি সূত্রের কথা বলেছেন। এরকম সূত্র অন্যান্য গণিতজ্ঞদের গ্রন্থে দেখা যায় না। তাই সূত্রটি উল্লেখ করতে হয়।

বীরসেনের মতে 'd' বৃত্তের ব্যাস হলে,

$$\pi \text{ (পাই)} = \frac{16d + 16}{113}$$

জৈন গণিতজ্ঞদের কথা সবিস্তারে বলার সুযোগ এখানে নেই। আমরা মাত্র দু-একজনের নাম উল্লেখ করলাম। বিস্তারিত বিবরণ লেখকের 'প্রাচীন ভারতীয় গণিতের ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

দ্বিতীয় আর্যভট

ইতিপূর্বে আমরা একাধিক আর্যভটের কথা বলেছি। আর্যভট বলতে প্রধানত প্রথম আর্যভটকেই বোঝায়। তাঁর প্রতিভার সঙ্গে দ্বিতীয় আর্যভটের তুলনা চলে না। দ্বিতীয় আর্যভট মহাবীরের পরবর্তী ; দশম শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। প্রথম আর্যভট ও দ্বিতীয় আর্যভটের মধ্যে সময়ের ব্যবধান পাঁচশ' বছর।

আর্যভট ক'জন ছিলেন ?

আমরা আগেই বলেছি, পণ্ডিতরা তিনজন আর্যভটের কথা বলে থাকেন। কিন্তু বর্তমানে দু-জনের বেশী আর্যভটের দেখা মেলে না। অলবেরুনীর একটি মন্তব্যকে কেন্দ্র করে তৃতীয় আর্যভটের কথা ভাবা

হয়। তাঁর মতে, তিনি প্রথম আর্যভটের পূর্ববর্তী। অলবেরুনীর মত একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না এইজন্য যে, দ্বিতীয় আর্যভট 'এক বৃদ্ধ আর্যভট'-এর উল্লেখ করেছেন তাঁর গ্রন্থে। তিনি বলেছেন, বৃদ্ধ আর্যভটের গ্রন্থে অনেক দোষ-ত্রুটি ছিল বলে সে-সব সংস্কার করে তাঁর গ্রন্থের সূত্রপাত। একথা যদি সত্য হয়, তা হলে দ্বিতীয় আর্যভটের গ্রন্থের সঙ্গে বৃদ্ধ আর্যভটের গ্রন্থের মিল থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু প্রথম আর্যভটের বই-এর সঙ্গে তাঁর বই-এর কোন মিল নেই। সুতরাং প্রথম আর্যভট যে বৃদ্ধ আর্যভট নন, তা প্রমাণিত হয়। অতএব, তৃতীয় কোন বৃদ্ধ আর্যভট ছিলেন। কিন্তু কালক্রমে তাঁর গ্রন্থ বিলুপ্ত হয়েছে। সুতরাং এরূপ মনে করা যায় যে, প্রাচীন ভারতে হয়তো তিনজন আর্যভট ছিলেন, কিন্তু একজনের কোন গ্রন্থ ও পরিচয় পাওয়া যায় না আজ পর্যন্ত।

'মহা-সিদ্ধান্ত'

দ্বিতীয় আর্যভট রচিত গ্রন্থের নাম 'মহা-সিদ্ধান্ত'। বৃদ্ধ আর্যভটের গ্রন্থের দোষ-ত্রুটি সংস্কার করে তাঁর এই গ্রন্থরচনা। বৃদ্ধ আর্যভটের কোন বই পাওয়া যায় না বলে তাঁর প্রয়াস কতখানি সার্থক হয়েছে তা বলা সম্ভব নয়। কিন্তু প্রথম আর্যভটের তুলনায় তাঁর গ্রন্থ অনেক নীচু মানের। বস্তুত, গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের আলোচনায় তাঁর বৈশিষ্ট্য ও মৌলিকতা নেই। তিনি গতানুগতিক পথেই চলেছেন—পূর্বাচার্যদের ধারা অক্ষুণ্ণ রাখার প্রয়াস পেয়েছেন মাত্র।

'মহা-সিদ্ধান্ত' গ্রন্থের আরো দুটি নাম আছে: 'আর্যসিদ্ধান্ত' বা 'আর্যভট সিদ্ধান্ত'। গ্রন্থটি আঠারোটি অধ্যায়ে বিভক্ত। অনির্ণেয় সমীকরণ ভারতীয় গণিতাচার্যদের অতি প্রিয় বিষয়। মহা-সিদ্ধান্তের শেষ অধ্যায়ে এই সমীকরণ নিয়ে আলোচনা আছে। তা ছাড়া তিনি সংস্কার করে এর সমাধান পদ্ধতির একটি ইঙ্গিতও দিয়েছেন। প্রথম আর্যভটের মত বর্ণমালার সাহায্যে সংখ্যা প্রকাশের এক নতুন কৌশল

তিনি উদ্ভাবন করেন। অবশ্য উভয়ের পদ্ধতির মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে।

দ্বিতীয় আর্যভট তাঁর পূর্ববর্তী অনেক গণিতাচার্যের তীব্র সমালোচনা করেছেন। বিশেষ করে শ্রীধরাচার্যের ট্রাপিজিয়ামের উচ্চতা নির্ণয়ের সূত্রটির সমালোচনা লক্ষ্য করার মত। সত্যি কথা বলতে কি, এই সমালোচনার প্রকৃত উদ্দেশ্য যেন অন্যরকম। সমালোচনা করে প্রতিষ্ঠিত গণিতজ্ঞের ত্রুটি দেখাবার ব্যর্থ প্রয়াস করে তিনি যেন সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করেছিলেন। সবক্ষেত্রে তাঁর সমালোচনা সার্থক হয়নি, কিন্তু কখনো কখনো কাকতালীয়ের মত ফল ফলেছিল।

সামান্তরিক ও রম্বসের একটি কর্ণ দেওয়া থাকলে দ্বিতীয় কর্ণ নির্ণয় করার সূত্র দ্বিতীয় আর্যভট দিয়েছেন। তাঁর সূত্রটি এরকম:

"বাহুগুলির বর্গের সমষ্টি থেকে কর্ণের বর্গ বিয়োগ করে বর্গমূল নির্ণয় করলে সামান্তরিকের ও রম্বসের দ্বিতীয় কর্ণ পাওয়া যায়।"

রম্বসের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের সূত্রও তাঁর গ্রন্থে দেখা যায়:

d_1 ও d রম্বসের কর্ণ হলে,

রম্বসের ক্ষেত্রফল $= \frac{1}{2} d_1 d_2$

আমরা জানি, রম্বসের কর্ণ পরস্পরকে সমকোনে ছেদ করে। এর প্রমাণ তাঁর মহা-সিদ্ধান্তে দেখতে পাওয়া যায়।

প্রতিভার গভীরতার দিক থেকে বিচার করলে প্রথম আর্যভটের সঙ্গে তাঁর তুলনা চলে না। কিন্তু ভারতীয় গণিতের ইতিহাসে তাঁকে উপেক্ষা করা যায় না। সংস্কার মানসে যে কাজে তিনি হস্তক্ষেপ করেছিলেন, হয়তো সবক্ষেত্রে সফল হননি। কিন্তু দু-একটি ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে তিনি সার্থক হয়েছেন।

শ্রীপতি

দ্বিতীয় আর্যভটের পরবর্তী গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিদ হচ্ছেন শ্রীপতি। ইনি সম্ভবত দশম শতাব্দীর শেষের দিকে অথবা একাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে জন্মগ্রহণ করে থাকবেন। অলবেরুনী যখন ভারতে এসেছিলেন,

তখন তিনি জীবিত ছিলেন বলে অনুমান করা হয়। তাঁর পিতার নাম নাগদেব ও পিতামহের নাম ভট্টকেশব। শ্রীপতির জন্মস্থান কাশ্মীরে হওয়া সম্ভব।

গ্রন্থ পরিচয়

তাঁর লেখা মোট চারটি বই পাওয়া যায়। এর মধ্যে তিনটিই আবার জ্যোতির্বিজ্ঞান সংক্রান্ত বই, আর একটিমাত্র গণিতের বই। তাঁর 'ধীকোটিকরণ' বইটি 1039 খ্রীস্টাব্দে রচিত হয়। এটি আর্যভটীয় গ্রন্থ অবলম্বনে লেখা এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানী লল্লের নির্দেশে সংশোধিত। তাঁর 'ধ্রুবমানস' বইটিও অপর একটি গ্রন্থ অবলম্বনে লেখা। সেই বইটির নাম 'লঘুমানস'। এই বইটির লেখকের নাম মুঞ্জাল। 'ধ্রুবমানস' 1056 খ্রীস্টাব্দে রচিত। 'সিদ্ধান্ত শেখর' তাঁর তৃতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানের বই। এই বইটি প্রভূত খ্যাতি অর্জন করতে সমর্থ হয়েছিল। এর রচনাকাল 1039 খ্রীস্টাব্দ।

গণিত বিষয়ে তাঁর একমাত্র গ্রন্থের নাম 'গণিত-তিলক'। গণিত সম্পর্কিত অন্যান্য বই-এর সঙ্গে এর একটি বড় পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। প্রাচীন ভারতের প্রায় সব গণিত বিষয়ক গ্রন্থেই পাটীগণিত, বীজগণিত ও জ্যামিতির আলোচনা কিছু কিছু আছে। কিন্তু 'গণিত-তিলক' শুদ্ধ পাটীগণিতের বই—এতে বীজগণিত ও জ্যামিতির আলোচনা নেই। এই ব্যতিক্রমের কারণ তিনি কোথাও ব্যাখ্যা করেননি। তাই এ-সম্পর্কে সঠিকভাবে কিছু বলা যায় না। যাই হোক, বইটি গণিতজ্ঞ মহলে খুব সমাদৃত হয়। তাই এর টীকাও দেখতে পাওয়া যায়। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে সিংহতিলক সুরী নামে এক গণিতজ্ঞ এই গ্রন্থের টীকা ভাষ্য রচনা করেন।

অবদান

তিনটি বাহু দিয়ে ত্রিভুজ হয়, আর চারটি বাহু দিয়ে চতুর্ভুজ হয়—একথা কে না জানে? কিন্তু যেমন-তেমন তিনটি বাহু দিয়ে কি ত্রিভুজ আঁকা যায় বা চারটি বাহু দিয়ে চতুর্ভুজ আঁকা? খুশী মত যে-কোন দৈর্ঘ্যের

বাহু নিয়ে যে ত্রিভুজ আঁকা যায় না, এটা আজ অনেক শিক্ষার্থী জানে। এমন কি, কোন সর্তে ত্রিভুজ আঁকা সম্ভব, তা-ও সকলের জানা। আমাদের দেশের প্রাচীন গণিতাচার্যরা এই সর্ত সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন, অন্ততপক্ষে দ্বিতীয় আর্যভট ও শ্রীপতি তো ছিলেনই।

শ্রীপতি তাঁর সিদ্ধান্তশেখর-এ ত্রিভুজ ও চতুর্ভুজ অঙ্কনের সর্ত উল্লেখ করেছেন। দুটি বাহুর সমষ্টি তৃতীয় বাহুর সমষ্টির চেয়ে বড় না হলে ত্রিভুজ আঁকা যায় না। কিন্তু কখন বা কোন সর্তে চতুর্ভুজ আঁকা সম্ভব? যারা জ্যামিতি খুঁটিয়ে পড়ে তাদের এটিও অজানা নয়। এখানে শ্রীপতি যে সর্তটি দিয়েছেন তার উল্লেখ করা হলো।

"চতুর্ভুজের সরল বাহুগুলির সমষ্টি বৃহত্তমটির চেয়ে ছোট বা সমান হলে জ্ঞানীরা জানেন যে, এটি সীমাবদ্ধ ক্ষেত্র নয়।"

শ্রীপতির ভাষার ভঙ্গীমাটি অন্য রকম। পরিচিত না থাকলে কেমন যেন খটমট মনে হয়। কিন্তু সহজ করে নিলে বুঝতে বিন্দুমাত্রও অসুবিধা হয়না। আসলে তিনি বলেছেন, চতুভূজের ছোট বাহুগুলির সমষ্টি বৃহত্তমটির চেয়ে বড় হলে তবেই চতুর্ভুজ অঙ্কন সম্ভব। আধুনিক গাণিতিক ভাষায়—

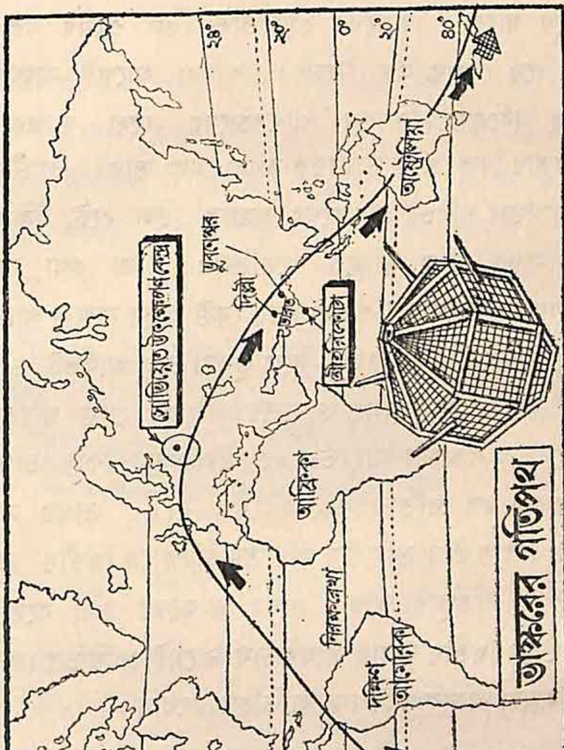
a, b ও c চতুর্ভুজের তিনটি বাহু ও d বৃহত্তম বাহু হলে,

$$a+b+c+ > d$$

শ্রীপতির ঠিক পরের কোন গণিতজ্ঞের নাম জানতে পারা যায় না। শ্রীপতির পর থেকেই উত্তর ভারতে রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখা দিতে শুরু করে। সুলতান মামুদের বার বার আক্রমণে সমাজে শান্তি শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হয়। সেজন্য সম্ভবত উত্তর ভারতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা ক্রমশ কমতে থাকে। তবে দক্ষিণ ভারতে গণিতচর্চা অব্যাহত থাকতে দেখা যায়, এবং ভাস্করাচার্যের পূর্ববর্তী অনেক গণিতজ্ঞের ও জ্যোতির্বিজ্ঞানীর নাম পাওয়া যায়। তবে তাঁদের প্রতিভার গভীরতা ও উজ্জ্বলতা ছিল না। যাই হোক, কেরালা রাজ্যে যে গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞানচর্চা চলতে থাকে, তার মূল্যও কম নয়। আমরা এ-বিষয়ে পৃথকভাবে আলোচনা করে তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করব।

ভাস্করাচার্য

নামের সঙ্গে স্বভাব-চরিত্রের, এমন কি চেহারার মিল খুব কমই দেখা যায়। অনেক সময় উল্টোটাই চোখে পড়ে। কানা ছেলের



ভারতীয় কৃত্রিম উপগ্রহ ভাস্কর-২-এর গতিপথ

নাম পদ্মলোচন বলে তো একটা কথাই আছে। কিন্তু কখনো কখনো নামের সঙ্গে গুণের, রূপের মিল হয়ে যায়, যদিও তা কম। দৃষ্টান্ত

বেশী না থাকলেও গণিতাচার্য ভাস্করের সঙ্গে তাঁর প্রতিভার এরূপ আশ্চর্যজনক মিল দেখা যায়। আমরা জানি, ভাস্কর শব্দের অর্থ সূর্য। সূর্যের মহিমার কথা বলে শেষ করা যায় না। সূর্য সব শক্তির উৎস। জীবজগৎ সূর্যের ওপর একান্ত নির্ভর। সূর্য না থাকলে জীবজগৎ ধ্বংস হয়ে যাবে। ভাস্করের প্রতিভাও ছিল সূর্যের মত উজ্জ্বল—চোখ ধাঁধিয়ে দেবার মত উজ্জ্বল। আমরা আগেই বলেছি, অতীত ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ তিনজন গণিতজ্ঞদের মধ্যে ভাস্কর অন্যতম। জনপ্রিয়তার দিক থেকে ভাস্করের তুলনা মেলা ভার। প্রাচীন ভারতের বহু গণিতজ্ঞের পরিচয় সাধারণের অজ্ঞাত ছিল বটে, কিন্তু ভাস্করের নাম ভারতের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। সত্যি কথা বলতে কি, ব্রহ্মগুপ্তের পর এমন জনপ্রিয়তা আর কেউ অর্জন করতে পারেননি।

আচার্য ভাস্করের প্রতিভার সঙ্গে তুলনা চলে আর্যভট ও ব্রহ্মগুপ্তের সঙ্গে। বস্তুতপক্ষে, তিনিও ভারতের সর্বশেষ শ্রেষ্ঠ গণিতজ্ঞ। তাঁর পরে অনেক গণিতজ্ঞের আবির্ভাব হয়েছিল সত্য, কিন্তু ভাস্করের সঙ্গে তুলনা করার মত প্রতিভা তাঁদের ছিল না। ভাস্কর নামে দু-জন গণিতজ্ঞ থাকায় ইনি ভারতীয় গণিতের ইতিহাসে দ্বিতীয় ভাস্কর নামে পরিচিত। ইতিপূর্বে আমরা প্রথম ভাস্করের কথা বলেছি। তবে সাধারণভাবে দ্বিতীয় ভাস্কর ভাস্করাচার্য নামেই পরিচিত। এই নামে তাঁকে আমরা অনেক জায়গায় অভিহিত করেছি।

পরিচয়

ভাস্করের পিতার নাম মহেশ্বর উপাধ্যায়। তিনি ছিলেন বেদজ্ঞ ও দৈবজ্ঞ অর্থাৎ জ্যোতিষশাস্ত্রে তাঁর প্রভূত জ্ঞান ছিল। তিনি ছিলেন দক্ষিণ ভারতের অধিবাসী। দক্ষিণ ভারতে সহ্য পর্বতের পাদদেশে বিজ্জড়বিড় নামে একটি গ্রাম ছিল। এখানে 1114 খ্রীস্টাব্দে ভাস্কর জন্মগ্রহণ করেন। বিজ্জড়বিড়ের আধুনিক নাম বিজাপুর। বরাহমিহিরের মত ভাস্করের পড়াশোনা শুরু হয় পিতার নিকট। গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞানে অসামান্য দক্ষতা অর্জন করার সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানের অন্যান্য

বিভাগেও সমান পারদর্শিতা লাভ করেন। তাঁর ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না; লীলাবতী সম্বন্ধে একটি উপকথা প্রচলিত রয়েছে মাত্র।

শ্রেষ্ঠ কীর্তি

ভাস্করের লেখা বই-এর সংখ্যা বেশী নয়—মাত্র দুটি। কিন্তু তাঁর খ্যাতি **'সিদ্ধান্ত শিরোমণি'** গ্রন্থটিকে ঘিরে। খুব জটিল বই এটি নয়। পাঠ্যপুস্তক রচনার ভঙ্গীতে লেখা বলে অনেকে মনে করেন ভাস্কর পাঠ্যপুস্তক হিসাবেই হয়তো 'সিদ্ধান্তশিরোমণি' লিখে থাকবেন।



সিদ্ধান্ত শিরোমণি পাণ্ডুলিপি

বইটি চারটি অধ্যায়ে বিভক্ত; 'লীলাবতী', 'বীজগণিত,' 'গ্রহণগণিত', ও 'গোলাধ্যায়', লীলাবতীর আলোচ্য বিষয় পাটীগণিত। এখানে সুন্দর ও চিত্তাকর্ষক অনেক অঙ্ক দেখা যায়। বীজগণিতে অনির্ণের সমীকরণ, বর্গ-প্রকৃতি ইত্যাদি, আর অন্য দুটিতে জ্যোতির্বিজ্ঞানের আলোচনা দেখা যায়। গোলাধ্যায়ের একটি অংশে নিঃসর্গ প্রকৃতির কাব্যিক বর্ণনা দেখা যায়। অবশ্য, এই বর্ণনার মধ্যে নতুনত্ব কম, গতানুগতিক সংস্কৃত কাব্যরীতির অনুসরণ রয়েছে মাত্র।

উচ্চ কল্পনাশক্তি না থাকলে বড় বিজ্ঞানী বা গণিতজ্ঞ হওয়া যায় না। অবশ্য কবি-কল্পনা ও বিজ্ঞানী-গণিতজ্ঞদের কল্পনার মধ্যে তফাৎ আছে। ভাস্করের কিন্তু দু-রকম কল্পনাই ছিল। তাঁর কবি-কল্পনা ছিল, আবার গণিতজ্ঞ হিসাবেও তাঁর উচ্চ কল্পনা ছিল।

বিনয়ী ভাস্কর

'বিদ্যা বিনয় দান করে' বলে সংস্কৃতে একটা কথা আছে। প্রকৃত বিদ্যা অর্জিত হলে, শিক্ষা সম্পূর্ণ হলে বিনয়ের প্রকাশ ঘটে। আচার্য ভাস্কর ছিলেন পরম বিনয়ী। তাঁর ছিল মৌলিক প্রতিভা—গর্ব করার মত প্রতিভা। কিন্তু তিনি কখনো এনিয়ে অহঙ্কার ও গর্ব করতেন না। যেমন, অতি বিনয়বশত তিনি বলেছেন, 'সিদ্ধান্ত শিরোমণি' রচনায় তার মৌলিকতা নেই। তিনি বলেছেন, এই গ্রন্থের উপাদান পূর্ববর্তী গণিতাচার্যদের বই থেকেই সংগ্রহ করেছেন। তাঁর কাজ কেবলমাত্র সঙ্কলকের। মহৎ হৃদয় ও বিনয়ী না হলে এমন করে কেউ বলতে পারে না।

তাঁর আগের গণিতাচার্যদের কাছে আচার্য ভাস্কর ঋণ স্বীকার করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেননি। শ্রীধরাচার্য ও অন্যান্য গণিজ্ঞদের দ্বিঘাত সমীকরণ সমাধানের পদ্ধতি উদ্ধৃতি সহকারে উল্লেখ না করলে ওই পদ্ধতি যে শ্রীধরাচার্যের আবিষ্কার, তা আমরা জানতেই পারতাম না। এইভাবে গণিতাচার্য পদ্মনাভের নাম জানতে পারা যায় তাঁর গ্রন্থ থেকেই।

লীলাবতী অংশে কি আছে ?

গণিতের প্রধান তিনটি শাখা,—পাটীগণিত, বীজগণিত ও জ্যামিতি। কিন্তু প্রাচীন যুগে এই তিনটি বিভাগ তত সুস্পষ্ট নয়। তখন পাটীগণিতের মধ্যে বীজগণিত ও জ্যামিতির কিছু কিছু বিষয় আলোচিত হতো। প্রাচীন ভারতের গণিত গ্রন্থগুলিতে এই রীতি দেখা যায়। ক্রমে ক্রমে এই তিনটি বিষয়ের বিষয়বস্তু স্পষ্ট হতে থাকে। 'সিদ্ধান্ত-শিরোমণি'-র লীলাবতী অংশে যদিও পাটীগণিতের আলোচনাই প্রধান হয়ে উঠেছে, তবুও এখানে ভারতীয় রীতি ও ঐতিহ্য অনুযায়ী জ্যামিতি,—বিশেষ করে সমকোণী ত্রিভুজ বিষয়ে সমস্যা ও কিছু কিছু পরিমিতি আলোচিত হয়েছে।

আবার বীজগণিতের সমীকরণ শেখা হচ্ছে বীজগণিত শেখার মূল

কথা। পাটীগণিতের অঙ্ক কষতে বীজগণিতের সমীকরণ খুব সাহায্য করে। শুধু সাহায্য করে কেন, একবার সমীকরণ তৈরী করতে পারলে অঙ্কটি খুব সহজে কষা যায়। সেইজন্য ভাস্কর খুব সংক্ষেপে পাটীগণিতের শিক্ষার্থীদের বীজগণিত শিক্ষা দেবার জন্য সমীকরণের আলোচনা করেছেন।

ভাস্কর নিজে লীলাবতীর কোন বিভাগ করেননি। কিন্তু পরবর্তী ভাষ্যকারগণ লীলাবতীতে যে-সব বিষয়বস্তু আছে তাকে সাজিয়ে তেরোটি বিভাগ করেছেন। এতে অবশ্য বইটি পড়ার নানা দিক থেকে সুবিধা হয়েছে। বিষয়ভিত্তিক বিভাগের জন্য এক-একটি বিভাগ পড়া ও সে-বিষয়ে বিস্তারিত জানতে সুবিধা হয়।

লীলাবতী-র প্রধান বৈশিষ্ট্য এর অঙ্কগুলি। এমন আনন্দজনক ও চিত্তাকর্ষক অঙ্ক খুব কম দেখতে পাওয়া যায়। অঙ্কগুলি পড়লে মনে হবে না কঠিন ও জটিল। কিন্তু কষতে গেলে যত সহজ মনে হয় তত সহজে হয় না। ভাস্কর কবি ছিলেন বলে বোধ হয় এমন অঙ্ক তৈরী করতে পেরেছিলেন।

প্রাচীন ভারতের কাব্য-সাহিত্য-দর্শন-বিজ্ঞান ইত্যাদি সংস্কৃত ভাষায় লেখা। 'সিদ্ধান্ত-শিরোমণি'-ও তাই। তাই অঙ্কগুলির সৌন্দর্য ও কাব্যময়তা উপলব্ধি করতে হলে সংস্কৃতে জ্ঞান থাকা দরকার। আমরা এখানে কয়েকটি অঙ্কের অনুবাদ দিলাম। অবশ্য তাতে আসল অর্থ বজায় থাকলেও মূল রস পরিবেশন করা সম্ভব নয়।

1. "বালিকে! একদল রাজহংসের বর্গমূলের 7/2 অংশ একটি দীঘির তীরে বিচরণ করছে ; বাকী দুটি জলে কেলি করছে। রাজহংসের সংখ্যা কত, বল।" [উঃ—16]

এর চেয়েও আরও সুন্দর ও মনোরঞ্জক অঙ্ক রয়েছে। আমরা আর একটি উদাহরণ দিচ্ছি।

2. এক ঝাঁক মক্ষিকার অর্ধেকের বর্গমূল এবং 8/9 অংশ মালতী ফুলের বনে মধুসংগ্রহে গেল ; একটি মক্ষিকা পদ্মের সুগন্ধে প্রলুব্ধ হয়ে

সন্ধ্যাকালে ফুলের ভেতর আবদ্ধ হওয়ায় মক্ষিরাণী সেখানে গুন্ গুন্ করে ঘুরতে লাগল। হে ভদ্রে, মক্ষিকার সংখ্যা কত ?

[উঃ—72]

লীলাবতীতে পরিমিতির কথা রয়েছে। এখানে কয়েকটি সূত্রের উল্লেখ করা হলো। লক্ষণীয় যে, কয়েকটি সূত্রের সঙ্গে আধুনিক সূত্রের বিস্ময়কর মিল রয়েছে।

(1) বৃত্তের ক্ষেত্রফল $=$ পরিধি $\times \frac{d}{4} = \frac{\pi d^2}{4} = \pi r^2$

[এখানে d = ব্যাস, এবং r = ব্যাসার্ধ]

(2) গোলকের পৃষ্ঠফল = বৃত্তের ক্ষেত্রফল $\times 4 = 4\pi r^2 = 4\pi r^2$

(3) গোলকের ঘনফল = পৃষ্ঠফল $\times \frac{2r}{6} = \frac{4}{3}\pi r^3$

(4) শঙ্কুর আয়তন $= \pi . \frac{d^2}{4} . \frac{h}{3}$ [h = উচ্চতা]

লীলাবতী একসময় সারা ভারতে পড়ানো হতো। এখন স্কুল-কলেজে আর প্রাচীন ভারতীয় গণিত পড়ানো হয় না সত্য, কিন্তু একসময় এমন টোল-চতুষ্পাঠী ছিল না যেখানে ভাস্করাচার্যের সিদ্ধান্ত শিরোমণি পড়ানো হতো না। লীলাবতী-তে বীজগণিতের আলোচনাও দেখা যায়, যদিও আচার্য ভাস্কর পৃথকভাবে এই বিষয়ে বহু তথ্য লিপিবদ্ধ করে গেছেন বীজগণিত অধ্যায়ে।

বীজগণিত নিয়ে দু-চার কথা

এখানে আছে মোট এগারোটি অধ্যায়। এখানে আলোচিত কিছু নাম আমাদের অনেকের খুব অপরিচিত হলেও আসলে এখানে সমীকরণের শ্রেণীবিভাগ বেশী লক্ষ্য করা যায়। সত্যি কথা বলতে কি, সমীকরণের এমন সুষ্ঠু শ্রেণীবিভাগ দেখলে আশ্চর্য হতে হয়। আচার্য ভাস্কর যে অতি উচ্চস্তরের শিক্ষক ছিলেন তাতে আর সন্দেহ থাকে না।

এই কাজটির পিছনে তাঁর শিক্ষক জীবনের মূল্যবান অভিজ্ঞতা রয়েছে। ছাত্ররা কি অসুবিধা ভোগ করে, কিভাবে তাদের অসুবিধা দূর করা যায়, এই শ্রেণীবিভাগের মধ্যে যেন তেমন চিন্তা আছে বলে মনে হয়।

এগারোটি অধ্যায়ের বিষয়বস্তু এরূপ: (1) ঘন-বিবরণ, (2) শূন্য-বিবরণ, (3) বর্ণ-বিবরণ, (4) করণী-বিবরণ, (5) কুট্টক-বিবরণ, (6) বর্গ-বিবরণ, (7) একবর্ণ-বিবরণ, (8) মধ্যমা-হরণ, (9) অনেকবর্ণ-সমীকরণ, (10) অনেকবর্ণ-মধ্যমাহরণ ও (11) ভাবিতা।

7নং থেকে 11 নং পর্যন্ত অধ্যায়ে নানা ধরনের সমীকরণের কথা বলা হয়েছে। স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা তার বেশ কয়েকটি জানে, যদিও অন্য নামে।

ভাস্করের শূন্য-ভাবনা

শূন্য নিয়ে ভাস্করাচার্যের আলোচনা যেন একেবারে মৌলিক। প্রাচীন ভারতীয় গণিতজ্ঞদের মধ্যে একমাত্র ব্রহ্মগুপ্ত ছাড়া এরকম মূল্যবান আলোচনা আর দেখা যায় না। সবার জানা, শূন্যকে কোন সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে ভাগফল শূন্য হয়। কিন্তু এর উল্টো হলে কি হবে? অর্থাৎ কোন সংখ্যাকে শূন্য দিয়ে ভাগ করলে কত হবে? আজ গণিতের অভূতপূর্ব উন্নতি হয়েছে—বহু শাখার সৃষ্টি হয়েছে। তাই এই প্রশ্নের উত্তর আজ অনেকের জানা। কিন্তু সেই আটশ' বছর আগে এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ ছিল না। গর্বের কথা যে, ভাস্করাচার্য উত্তর দিতে সমর্থ হয়েছিলেন। তিনি বলেছেন, কোন রাশিকে শূন্য দিয়ে ভাগ করলে ভাগফল অনন্ত বা অসীম হয়। কি অলৌকিক প্রতিভা, কি অনন্তপ্রসারী দৃষ্টি!

স্কুল বীজগণিতে গণনার প্রাধান্য, সমস্যা সমাধানের প্রাধান্য তত নয়। তাই অনেক সময় বীজগণিত নীরস ও শুষ্ক বলে মনে হয়। কিন্তু এই বিষয়টির সৌন্দর্য, রসমাধুর্য কম নয়। চিত্তাকর্ষক সমস্যা পরিবেশ করতে পারলে বিষয়টি কি রকম আকর্ষণীয় হয়, তার বহু

উদাহরণ ভস্করাচার্যের বীজগণিতে রয়েছে। মনে হয়, অঙ্ক যাতে ভাল লাগে তার জন্যই ভাস্কর এরকম কৌশল অবলম্বন করেছিলেন। এখানে আমরা একটি মাত্র অঙ্ক দিয়ে তার সমাধান তুলে ধরব।

একগুচ্ছ পদ্মফুলের মধ্যে থেকে এক-তৃতীয়াংশ, এক-পঞ্চমাংশ, ও এক-ষষ্ঠাংশ যথাক্রমে ভগবান শিব, বিষ্ণু ও সূর্যকে অর্ঘ্য প্রদান করা হলো ; এবং দেবী ভবানীর উদ্দেশ্যে এক-চতুর্থাংশ নিবেদিত হলো। অবশিষ্ট 6টি ফুল পূজনীয় আচার্যদেবকে প্রদান করা হলে, পদ্মফুলের সংখ্যা কত ?

পদ্মফুলের সংখ্যা x হলে, অঙ্কের সর্তানুসারে,

$$x - \left(\frac{x}{3} + \frac{x}{5} + \frac{x}{6} + \frac{x}{4}\right) = 6$$

সরলীকরণের পর দাঁড়ায়,

$$\frac{x}{20} = 6$$

বা, $x = 120$

অতএব, পদ্মফুলের সংখ্যা = 120

জ্যামিতি নিয়ে নতন ভাবনা

বৃত্ত ও গোলক সম্বন্ধে অনেক নতুন কথা বলেছেন ভাস্কর। এ-বিষয়ে পূর্ববর্তী গণিতাচার্যদের সহিত তাঁর বেশ কিছুটা তফাৎ রয়েছে। ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ ও ট্রাপিজিয়াম সম্পর্কে তিনি তেমন নতুন কোন তথ্য দেননি—পূর্ববর্তীদের অনুসরণ করেছেন। তিনি সমকোণী ত্রিভুজ ও সদৃশ ত্রিভুজের ধর্মগুলি ব্যবহারিক সমস্যা সমাধানে বেশ কাজে লাগিয়েছেন।

ট্রাপিজিয়াম নিয়ে আলোচনা বৈদিক যুগ থেকেই দেখা যায়। কিন্তু এই জ্যামিতিক চিত্রটির সুন্দর একটি নামের বহুদিন ধরে অভাব ছিল। আচার্য ভাস্কর ট্রাপিজিয়ামের সুন্দর নামকরণ করেছেন : **'সমলম্বচতুর্ভুজ'** শ্রীধর, মহাবীর প্রমুখ ত্রিভুজ ও চতুর্ভুজ অঙ্কনের

সর্ত নিয়ে আলোচনা করেছেন। কিন্তু ট্রাপিজিয়াম অঙ্কনের সর্ত কি? এই সর্ত সর্বপ্রথম ভাস্কর দিয়েছেন। তাঁর সর্ত এরূপ :

"ট্রাপিজিয়ামের একটি তির্যক বাহু ও সম্মুখীন বাহুর সমষ্টি ক্ষুদ্রতর তির্যক বাহু ও ভূমির সমষ্টি অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর হবে"। অর্থাৎ একটি তির্যক বাহু = a, সম্মুখীন বাহু = b, ক্ষুদ্রতর তির্যক বাহু = c এবং ভূমি = d হলে $a+b<c+d$

আরো সহজ করে বললে, ট্রাপিজিয়ামের সব চেয়ে ছোট তির্যক বাহু ও ভূমির যোগফল অন্য দুটি বাহুর যোগফলের চেয়ে বড় হবে।

গণিতের আরো উন্নত শাখায় ভাস্করের গবেষণা ছিল। যেমন, ত্রিকোণমিতি, কলন ইত্যাদি। কিন্তু সে সব বিষয় নিয়ে আলোচনা এখানে সম্ভব নয়।

ভাস্কর ও নিউটন

স্যার আইজ্যাক নিউটন মহাকর্ষ-সূত্র আবিষ্কার করেছিলেন। এইজন্য বিজ্ঞান জগতে তিনি অমর হয়ে আছেন। কিন্তু নিউটনের আগে আর কেউ কি মহাকর্ষ সম্বন্ধে কোন ধারণা করেছিলেন? অন্য দেশে কে কি করেছিলেন জানি না, কিন্তু আমাদের দেশে অন্তত একজন করেছিলেন। তাঁর নাম ভাস্করাচার্য। নিউটনের পাঁচশ' বছর আগে কি করে যে তিনি এ বিষয়ে চিন্তা করেছিলেন, তা ভাবলেও অবাক হতে হয়।

ভাস্কর সিদ্ধান্ত শিরোমণির এক জায়গায় এরকম প্রশ্ন করেছিলেন, "গ্রহগণ দ্বারা পরিবেষ্টিত এই পৃথিবী কাহার দ্বারা ধৃত রহিয়াছে যেহেতু নীচে পড়িতেছে না?"

প্রশ্নটি তাঁর, আবার তিনি নিজেই উত্তর দিয়েছেন। তাঁর উত্তর : "পৃথিবীর আকর্ষণ-শক্তি আছে। সেই শক্তি দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া উপরিস্থিত ভারী বস্তু পৃথিবীতে পতিত হয়। সকল দিকে সমান আকর্ষণে আবদ্ধ এই পৃথিবী আকাশে কোথায় পড়িবে?"

নিউটন এসব কথাই একটু অন্যরকম করে বলেছেন—গণিতের

ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। এইখানে তাঁর কৃতিত্ব। কিন্তু ভাস্করাচার্য যে সেই দ্বাদশ শতাব্দীতে এরকম চিন্তা করতে পেরেছিলেন, তা এক যুগান্তকারী ঘটনা বলেই চিহ্নিত করা উচিত।

লীলাবতী কিংবদন্তী

প্রাচীন ভারতীয় সমাজে নারীর স্থান ছিল উচ্চে। সেইজন্য খুব প্রাচীন কাল থেকেই এদেশে নারী-প্রতিভার বিকাশ হয়েছিল। বৈদিক যুগে মৈত্রেয়ী, গার্গী, লোপামুদ্রা, ঘোষা প্রভৃতি বিদুষী নারীদের বিশেষ শ্রদ্ধার ও সম্মানের আসন ছিল। কিন্তু এঁরা সবাই ছিলেন দার্শনিক। প্রাচীন ভারতে মহিলা গণিতজ্ঞ হিসাবে যাঁর নাম পাওয়া যায় তিনি হচ্ছেন লীলাবতী। ইনি ভাস্করাচার্যের আদরের মেয়ে।

কথিত আছে, ভাস্করাচার্য নাকি তাঁর মেয়ের নাম স্মরণীয় করে রাখার জন্য সিদ্ধান্ত শিরোমনির পাটীগণিত অংশের নামকরণ করেন 'লীলাবতী'। আবার এমন কিংবদন্তী আছে, লীলাবতী নিজেই নাকি পাটীগণিত অংশ রচনা করেন। আসলে কোনটা সত্য নির্ণয় করা দুরূহ।

আচার্য ভাস্করের ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে কিছু জানা না গেলেও একটি উপকাহিনীকে কেন্দ্র করে তাঁর জীবনের কিছু পরিচয় পাওয়া যায়, আর লীলাবতী সম্বন্ধেও সামান্য জানা যায়। কিন্তু এই কাহিনীর সত্য-মিথ্যা সম্বন্ধে কিছুই বলা যায় না। যাই হোক, গল্পটি এরকম।

আচার্যদেব যেমন ছিলেন বড় গণিতজ্ঞ তেমনি ছিলেন বড় জ্যোতির্বিদ। তাছাড়া তিনি অসাধারণ দৈবজ্ঞ ছিলেন। মেয়ের ঠিকুজি গণনা করে জানতে পারলেন বিয়ের পরে মেয়ে বিধবা হবে। লীলাবতীর এই ছিল বিধিলিপি।

তখন ভাস্কর চিন্তা করতে লাগলেন কিভাবে মেয়ের বৈধব্য এড়ানো যায় বা অন্য কোন উপায় আছে কিনা।

একবার ভাবলেন মেয়ের বিয়ে দেবেন না। কিন্তু তা সম্ভব নয়। কারণ, সমাজে অনূঢ়া কন্যা রাখা শাস্ত্রসম্মত নয়। শাস্ত্র অগ্রাহ্য

করলে সমাজে কলঙ্ক রটবে। চরম এই বিপদ থেকে পরিত্রাণ পাবার আশায় তিনি সূক্ষ্ম জ্যোতিষিক গণনায় মনোনিবেশ করলেন।

আশার আলো দেখতে পেয়ে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন ভাস্কর। একটি মাত্র পথ তিনি খুঁজে পেলেন। একটি দিনের একমাত্র মুহূর্ত ছিল যখন বিয়ে দিলে কন্যার বৈধব্য এড়ানো যাবে।

লীলাবতী বড় হলো, বিয়ের যোগ্য হলো। ভাস্কর বিয়ের আয়োজন করলেন। আগে থেকেই বার বার অঙ্ক কষে দিন ও মুহূর্ত গণনা করে রেখেছিলেন। নিখুঁত সময় জানার জন্য ঘড়িও বানিয়ে রেখেছিলেন। তবে এখনকার মত স্প্রীংঘড়ি নয়—বালুকা ঘড়ি। একটি পাত্রের নীচে সূক্ষ্ম ছিদ্র করে বালুকা-ভর্তি করে দেওয়া হতো। ছিদ্র দিয়ে বালুকা পড়ে জমা হতো অন্য পাত্রে। এইভাবে সময় গণনা করা হতো।

বিয়ের আগের দিন। কি জানি কার মন্ত্রণায় লীলাবতী কৌতূহলী হয়ে উঠল বালুকা ঘড়ি দেখতে। সারা গায়ে অলঙ্কার পরে চঞ্চলা বালিকা ছুটে গেল সেখানে যেখানে আছে কালনির্ধারক যন্ত্র—সেই বালুকা ঘড়ি। বিস্ময়ে অবাক হয়ে লীলাবতী অপূর্ব ঘড়ি দেখছে। কিন্তু টুপ্ করে তার অজ্ঞাতে দুল থেকে একটি ছোট মুক্তাখণ্ড খসে পড়ল বালিতে। সঙ্গে সঙ্গে ডুবে গেল। যা ঘটার ঘটে গেল সবার অলক্ষে।

বিয়ে হলো ধূমধাম করে। আচার্য ভাস্কর স্বয়ং ঘড়ি দেখে মুহূর্ত গণনা করলেন। শুভলগ্নে বিয়ে দিয়ে কন্যাদায় থেকে উদ্ধার পেয়ে নিশ্চয়ই তিনি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছিলেন।

অচিরে বিধবা হলো লীলাবতী। ভাস্করের মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ল। হয়ত সাময়িক ভাবে নিজের জ্যোতিষ প্রতিভা সম্পর্কে আস্থা হারিয়ে ফেলেছিলেন তিনি। কিন্তু মনীষীরা বিপদে কাতর হলেও কখনো আত্মহারা হন না। অনুমান করা যায়, পরে সঠিক কারণ অনুসন্ধান করে জেনেছিলেন।

লীলাবতী কাহিনীর এখানে শেষ। কিন্তু শেষ বললেই শেষ হয় না। একটা তারপর থেকে যায়। কিন্তু সেটা কল্পনার—অনুমানের।

সে যুগে বিধবা বিবাহ ছিল না। অনুমান করা যায়, ভাস্কর

কন্যাকে সস্নেহে কাছে টেনে নিয়েছিলেন। লীলাবতী খুব সম্ভব বাবার টোল চতুষ্পাঠীতেই পড়াশোনা করেছিল। গণিতজ্ঞ পিতার অধীনে লীলাবতীর গণিতে পারদর্শী হয়ে ওঠা অসম্ভব ছিল না। এমনকি পিতার অবর্তমানে অধ্যাপনা করাও অসম্ভব ছিল না। কিন্তু এ সবই কল্পনা, অনুমান মাত্র।

নারায়ণ পণ্ডিত

একাধিক আর্যভট ও ভাস্করের মত একাধিক নারায়ণ আছেন ভারতীয় গণিতে। দু'তিন জন নয়, অন্তত আটজন নারায়ণ নামধারী গণিতজ্ঞের পরিচয় পাওয়া যায়। অবশ্য সবাই মৌলিক প্রতিভার অধিকারী ছিলেন না, আর সবার পরিচিতিও তেমন ব্যাপক ছিল না। তবে গণিতচর্চ্চায় সামান্য হলেও প্রত্যেকের কিছু অবদান আছে। কিন্তু গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিদ নারায়ণ পণ্ডিতের খ্যাতি ও অবদান সবচেয়ে বেশী। তাই তাঁর সম্বন্ধে এখানে সামান্য কিছু আলোচনা করা হলো।

চতুর্দশ শতাব্দীতে ফিরোজ শাহের রাজত্বকালে নারায়ণ পণ্ডিত বর্তমান ছিলেন। ভারতীয় গণিতে তিন প্রধান গণিতজ্ঞের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। নারায়ণ পণ্ডিতের উপর আর্যভটের প্রভাব কতখানি ছিল, জানা যায় না। তবে তাঁর ওপর ভাস্করাচার্যের প্রভূত প্রভাব দেখা যায়। অবশ্য দ্বাদশ শতাব্দীর পর ভারতের বহু গণিতজ্ঞ ভাস্করাচার্যের প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারেননি। ভাস্করের 'সিদ্ধান্তশিরোমণি'-কে বহু গণিতজ্ঞ মাথায় করে রেখেছিলেন বলা যায়। যাই হোক, নারায়ণ পণ্ডিতের ব্যক্তিগত পরিচয় তেমন পাওয়া যায় না। তবে তাঁর পিতার নাম নৃসিংহ দৈবজ্ঞ। খুব সম্ভব নৃসিংহ দৈবজ্ঞ জ্যোতিষ ও জ্যোতি-র্বিজ্ঞানের চর্চা করতেন।

রচনা

নারায়ণ পাটীগণিত ও বীজগণিত সম্বন্ধে দুটি বই লেখেন। একটির নাম **'গণিতকৌমুদী'** ও অপরটির নাম **'বীজগণিতাবতাংশ'**। 'গণিত-কৌমুদী' খুব মূল্যবান গ্রন্থ বলে বিবেচিত হয়। এই বই-এ সে-সময়কার

ভারতীয় গণিতজ্ঞদের গণিতজ্ঞানের বিস্তারিত ও পূর্ণ বিবরণ আছে। বীজগণিত বইটি পড়লে নারায়নের গাণিতিক প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। এই বইটি দুটি অংশে বিভক্ত। প্রথম ভাগে চিহ্ন-সূত্র, পাটীগণিতে শূন্যের ব্যবহার, অজ্ঞাত রাশির প্রক্রিয়া, করণী, চূর্ণন ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা দেখা যায়। দ্বিতীয় ভাগে সরল সমীকরণ ও আরো অনেক বিষয়ের আলোচনা লক্ষ্য করা যায়।

অসাবধানতা

নারায়ণ পণ্ডিতের গণিতে পারদর্শিতা ও নৈপুণ্যের যে অভাব ছিল না, তাতে সন্দেহ নেই। তাঁর গাণিতিক প্রতিভা সম্বন্ধে পণ্ডিতরাও একমত বটে, কিন্তু তিনি মাঝে মাঝে এমন ব্যর্থ হয়েছেন যে ভাবলে অবাক না হয়ে পারা যায় না। এখানে বিস্তারিত আলোচনা করার কোন সুযোগই নেই। তাই মাত্র দুটি উদাহরণ তুলে ধরা যাক।

শ্রেণী (series) নিয়ে আলোচনা ভারতে অতি প্রাচীনকাল থেকেই দেখা যায়। নারায়ণের আগের গণিতাচার্যরা এই আলোচনায় সব জায়গায় কৃতিত্বের সহিত সফল হয়েছেন। কিন্তু তাঁর আলোচনায় কোন বৈশিষ্ট্য দেখা যায় না। আর একটি বিষয়ে তিনি দারুণভাবে ব্যর্থ হয়েছেন। এ-বিষয়টিও খুব প্রাচীন—বৈদিক যুগ থেকে এ-নিয়ে আলোচনা দেখা যায়। আমি π-এর মান নির্ণয় সম্পর্কে বলছি। আমরা ইতিপূর্বেই দেখেছি, আর্যভট-ব্রহ্মগুপ্ত-শ্রীধর প্রমুখ গণিতজ্ঞ এ-বিষয়ে গবেষণা করে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। কিন্তু নারায়ণের আলোচনা এমন ব্যর্থ যে অবাক না হয়ে পারা যায় না।

নতুন কথা

তবে নারায়ণ যে সব জায়গায় বা বেশীর ভাগ জায়গায় ব্যর্থ হয়েছেন, তা নয়। প্রধানত ওই দুটি বিষয় ছাড়া অন্যসব বিষয়ে তিনি অনেক নতুন কথা বলেছেন। এ-বিষয়ে নারায়ণের বর্গ-নির্ণয়ের সূত্রটির কথা বলা যেতে পারে। অবশ্য সূত্রটি আমাদের সবার জানা। কিন্তু

সেই চতুর্দশ শতাব্দীতে অর্থাৎ প্রায় ছশ'বছর আগে এমন সূত্র আবিষ্কার প্রকৃত প্রতিভা ব্যতিরেকে সম্ভব নয়। এটি তাঁর অন্যতম কৃতিত্ব বলে দাবী করা যেতে পারে। সূত্রটি এরকম :

A = যে কোন সংখ্যা, a ও b ওই সংখ্যার দুটি অংশ হলে,

$$A^2 = (a+b)^2 = (a-b)^2 + 4ab$$

শূন্য বড় গোলমালে জিনিস। গণিতে এর সঠিক অর্থ ও প্রক্রিয়াতে প্রয়োগ বুঝে নেওয়া সব সময় সহজ হয় না। আমরা প্রথমেই বলেছি, প্রাচীন ভারতে এর উদ্ভব। আর তাঁরাই এর প্রক্রিয়াগুলি আবিষ্কার করেন। কিন্তু ওই গোলমালে প্রকৃতির জন্য অনেক সময় অনেকে এর তাৎপর্য বুঝে উঠতে পারেননি। ফলে, ভুল সিদ্ধান্ত হয়েছে। আচার্য মহাবীর এরকম একটি ভুল সিদ্ধান্ত করেছিলেন। কিন্তু অপেক্ষাকৃত স্বল্প প্রতিভাধর নারায়ণ কোন ভুল করেননি। শূন্যের তাৎপর্য সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন।

যোগ-বিয়োগ-গুণ প্রক্রিয়ায় শূন্যের প্রয়োগে বিশেষ জটিলতা নেই —বুঝতেও কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু জটিলতা আসে শূন্য দ্বারা ভাগের প্রশ্নটি যখন আসে। এখানে শূন্যের নতুন রূপ দেখা যায়— তাৎপর্যের মহিমা প্রকাশ পায়। যাই হোক, শূন্য সম্পর্কে নারায়ণের অভিমত জেনে নেওয়া যাক।

শূন্য সম্পর্কে ধারণার কথা নারায়ণ তাঁর 'গণিতকৌমুদী' গ্রন্থে ব্যক্ত করেছেন। ওই গ্রন্থের এক জায়গায় বলেছেন, পাটীগণিতে শূন্য দ্বারা ভাগ স্বীকৃত নয়। তাই এখানে এ-বিষয়ে কিছু আলোচনা করছেন না। কিন্তু বীজগণিতে শূন্য দ্বারা ভাগের প্রয়োগ আছে—আলোচনার সুযোগও আছে। তাই বীজগণিতে বিষয়টি আলোচনা করেছেন।

গুণ ঠিক হয়েছে কি না কি করে বোঝা যায় ? এর কি কোন সহজ ও সরল পদ্ধতি আছে, না আবার গুণ করে ঠিক হয়েছে কিনা দেখতে হবে ? সাধারণত গুণফল ঠিক হয়েছে কিনা দেখার জন্য পুনরায় গুণ করা হয়। গুণ অঙ্কটি ছোট হলে এরকম করা যেতে পারে। কিন্তু বড় বড় সংখ্যার গুণ মেলাতে হলে ? গণিতজ্ঞ নারায়ণ গুণ মেলাবার

অর্থাৎ গুণের যাথার্থ নির্ণয়ের একটি সূত্র দিয়েছেন। যে-কোন সংখ্যার গুণফলের সত্যতা যাচাই করতে নিয়মটি খুবই কার্যকর। এ-বিষয়ে লেখকের 'গণিতের ললিত পাঠ' বই-এ আলোচনা আছে। আগ্রহীরা দেখতে পারেন।

ব্রহ্মগুপ্তের কথা বলতে গিয়ে বৃত্তে অন্তর্লিখিত উপপাদ্যের কথা বলেছি। 'ব্রহ্মগুপ্তের উপপাদ্য' নামে বিশ্বখ্যাত উপপাদ্যের উল্লেখও করা হয়েছে। এ-বিষয় তাঁর পর উল্লেখযোগ্য কারুর অবদান যদি থাকে, তা হলে নারায়ণ পণ্ডিতের নাম করতে হয়। কিন্তু চতুর্ভুজ নিয়ে দু-এক কথা বলার আগে ত্রিভুজ নিয়ে সামান্য আলোচনা করা দরকার।

নারায়ণের গ্রন্থে ত্রিভুজ বিষয়ে পূর্বাচার্যদের আলোচনার বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। প্রাচীন ভারতে ত্রিভুজ নিয়ে এরূপ আলোচনা এক জায়গায় পাওয়ার জন্য আমাদের তাঁর কাছে অবশ্যই কৃতজ্ঞ থাকতে হয়। ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের একাধিক সূত্র সম্বন্ধে পাঠকরা ইতিপূর্বেই অবহিত হয়েছেন। কিন্তু নারায়ণ তাঁর গ্রন্থে আর একটি অভিনব সূত্রের অবতারণা করেছেন। খুব সম্ভব এটি তাঁর আবিষ্কার। কারণ, সূত্রটি আগের কোন গ্রন্থে দেখা যায় না। স্কুলের সিলেবাসেও ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলের সূত্র আছে। ছাত্র-ছাত্রীরা নারায়ণের সূত্রটি নিয়ে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের পরীক্ষা করতে পারে। আগ্রহী পাঠকদের জন্য সূত্রটি দেওয়া হলো ঃ

সূত্র ঃ "ত্রিভুজের তিনটি বাহুর গুণফলকে পরিব্যাসার্ধের চার গুণ দিয়ে ভাগ করলে ক্ষেত্রফল পাওয়া যায়।"

গণিতের ভাষায় a, b, c ত্রিভুজের তিনটি বাহু এবং r পরিব্যাসার্ধ হলে,

$$\text{ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল} = \frac{abc}{4r}$$

এক পা এগিয়ে

আমরা সাধারণত চতুর্ভুজের দুটি কর্ণের কথাই জানি। নারায়ণ বৃত্তে অন্তর্লিখিত চতুর্ভুজের তিনটি কর্ণের কথা বলেছেন। এ এক অভিনব

সিদ্ধান্ত। এখানে তিনি আচার্য ব্রহ্মগুপ্তের চেয়ে একটু বেশী এগিয়ে গেছেন বলে মনে হয়।

কেবল তিনটি কর্ণের কথাই নয়। এই কর্ণের সাহায্যে আবার কিভাবে চতুর্ভুজের ক্ষেত্রফল পাওয়া যায় তার সূত্রও তিনি দিয়েছেন। বলা বাহুল্য, এটি নতুন সূত্র।

সূত্র ঃ "কর্ণ তিনটির গুণফলকে পরিব্যাসার্ধের দ্বিগুণ দিয়ে ভাগ করলে ক্ষেত্রফল পাওয়া যায়।"

নারায়ণ পণ্ডিত সম্বন্ধে এতক্ষণ যে আলোচনা করা হলো তাতে আমরা তাঁর প্রতিভার দুটি দিক দেখতে পাই। এক ঃ গণিতে তাঁর মৌলিক প্রতিভা ছিল। সেজন্য অনেক নতুন কথা তিনি বলেছেন। এমন কি, শ্রেষ্ঠ গণিতাচার্যদের চেয়ে কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁর মৌলিকতা রয়েছে। দুই ঃ আবার কোন কোন জায়গায় তিনি তেমন সাফল্য অর্জন করতে পারেননি। তাঁর জীবনে সফলতা ও বিফলতা দুই-ই ছিল। তিনি প্রথম শ্রেণীর গণিতজ্ঞ না হলেও ভারতীয় গণিতে তাঁর স্থান নির্দিষ্ট ও স্মরণযোগ্য।

পৃথূদকস্বামী

সৃজনশীল গণিতজ্ঞ হিসাবে পৃথূদকস্বামীর নাম করা যায় না। তিনি ছিলেন প্রধানত ভাষ্যকার। অন্যের গ্রন্থের দুরূহ ও জটিল অংশের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে তিনি সুনাম অর্জন করেন। তবে ব্রহ্মগুপ্ত ছাড়া আর কোন গণিতজ্ঞের গ্রন্থের ওপর ভাষ্য-রচনা করেননি। আচার্য ব্রহ্মগুপ্তের দুটি বিশ্বখ্যাত গ্রন্থ 'ব্রহ্মস্ফুট সিদ্ধান্ত' ও খণ্ডখাদ্যকের ওপর শ্রেষ্ঠ ভাষ্য তাঁরই রচনা। সত্যই তাঁর ভাষ্য না থাকলে ওই দুটি মূল গ্রন্থের সকল বিষয় বোঝা দুরূহ ছিল। কারণ, ওই দুটি সংক্ষিপ্ত আকারে ছন্দে রচিত ও অনেক জায়গায় এমন জটিল যে বোঝা অসম্ভব বললেই চলে। কিন্তু এই দুরূহতা ও জটিলতা মুক্ত করেছেন পৃথূদকস্বামী। এই মহৎ কার্যের জন্যই তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন, সন্দেহ নেই।

তাঁর আবির্ভাবের সঠিক কাল নির্ধারণ অসম্ভব। তবে পণ্ডিতরা

বলেন, তিনি নবম শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে বর্তমান ছিলেন। তাঁর পিতার নাম মধুসূদন ভট্ট। বিখ্যাত গণিতজ্ঞ শ্রীপতি তাঁর গ্রন্থে পৃথুদকস্বামীর নাম উল্লেখ করেছেন। এ থেকে বুঝতে পারা যায়, প্রাচীনকালেই ভাষ্যকার হিসাবে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে।

অন্ধ ভক্ত নয়

সন্দেহ করার হেতু নেই যে, পৃথূদকস্বামী আচার্য ব্রহ্মগুপ্তের অনুরাগী ও ভক্ত ছিলেন। আচার্যের মত ও পথে তাঁর সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল। কিন্তু তিনি অন্ধ ভক্ত ছিলেন না। আচার্যের গুণ যেমন কীর্তন করেছেন, তেমনি আবার তাঁর দোষের বা ত্রুটির কথা বলতেও দ্বিধা করেননি। একটি বিষয়ে অন্তত তিনি ব্রহ্মগুপ্তের মত সমর্থন করেননি। আর্যভট ভূ-ভ্রমণবাদের প্রবক্তা। ব্রহ্মগুপ্ত এই মত সমর্থন করেননি, এবং আর্যভটের তীব্র সমালোচনা করেছেন। পৃথূদকস্বামী কিন্তু তাঁর ভাষ্যে আর্যভটের মত সমর্থন করেছেন, এবং ব্রহ্মগুপ্তের মতের সমালোচনা করেছেন। এতে তাঁর বৈজ্ঞানিক নিরপেক্ষতা প্রমাণিত হয়। শুধু তাই নয়, যুক্তি-তর্ক, গণিত ইত্যাদি দিয়ে সব বিষয় বোঝার ক্ষমতা ছিল। তা-ও প্রমাণিত হয়।

তাঁর রচিত ভাষ্য গ্রন্থগুলিতে অনেক অঙ্কের উদাহরণ দেখতে পাওয়া যায়। পণ্ডিতরা মনে করেন, অনেক অঙ্ক তিনি নিজে তৈরী করেছেন আলোচিত বিষয় স্পষ্ট করার জন্য। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, কোন অঙ্কগুলি তাঁর নিজের উদ্ভাবন, আর কোনগুলি ব্রহ্মগুপ্তের, তা বোঝা সম্ভব নয়। কারণ, তিনি নিজে এ-বিষয়ে একটি কথাও বলেননি। তবে অনুমান করা যায়, তিনি স্বয়ং কিছু হলেও অঙ্ক তৈরী করে থাকবেন।

জ্ঞানতপস্বী

কেবলমাত্র গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞান নয়, অন্য বিষয়ে তাঁর গভীর পাণ্ডিত্য ছিল। নিজেকে 'চতুর্বেদাচার্য' বলে অভিহিত করেছেন তিনি।

চতুর্বেদাচার্যের অর্থ চার বেদের আচার্য। খুব সম্ভব কোন বৈদিক প্রতিষ্ঠান থেকে তিনি এই সম্মানসূচক উপাধি পেয়ে থাকবেন। এটা তাঁর গভীর পাণ্ডিত্যের অন্যতম স্বীকৃতি সন্দেহ নেই। নিঃসন্দেহে তিনি কোন প্রতিষ্ঠানে গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের আচার্য ছিলেন। তবে ওই দুটি বিষয় ছাড়াও ঋক্, সাম, যজু ও অথর্ব বেদও তাঁর অধ্যাপনার বিষয় ছিল বলে মনে হয়।

পরমেশ্বর

ভাস্করাচার্যের পর ভারতে তেমন আর উজ্জ্বল গাণিতিক প্রতিভা দেখা যায় না। দ্বাদশ শতাব্দীর পর এদেশে গণিতে অবক্ষয় ও ও অধঃপতনের যুগ শুরু হয়। ঐতিহাসিকদের এই কথা সম্পূর্ণ সত্য যদি নাও হয়, অন্তত আংশিক সত্য স্বীকার করতে হবে। আর্যভট-ব্রহ্মগুপ্ত ভাস্করাচার্যের মত প্রতিভা ভারতে আর দেখা যায় না। কেন এরকম হলো তার অবশ্য ঐতিহাসিক কারণ রয়েছে। কিন্তু সে-সবের মধ্যে না গিয়েও বলা যায় যে, ওই সময়ের পর থেকে এদেশে—বিশেষত উত্তর ভারতে গণিতচর্চার অনুকূল অবস্থা ছিল না।

দক্ষিণ ভারতে গণিতচর্চা

দ্বাদশ শতাব্দীর পর উত্তর ভারত থেকে গণিতচর্চা প্রায় বিদায় নিলেও গাণিতিক গবেষণা ও চর্চা দক্ষিণ ভারতে অব্যাহত ছিল। সমগ্র ভারতের পক্ষে এটা আশা ও সান্ত্বনার কথা, সন্দেহ নেই। যাই হোক, এতক্ষণ আমরা উত্তর ভারতের বহু গণিতজ্ঞদের অবদান নিয়ে আলোচনা করেছি। কিন্তু এবার আমরা যাঁদের কথা বলব তাঁরা প্রায় সবাই দক্ষিণ ভারতের। উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিম এরকমভাবে ভারতের বিশেষ বিশেষ অঞ্চলের কথা বললেও এবং তাঁদের আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য কিছু থাকলেও আসলে এই গাণিতিক ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সমগ্র ভারতের এ কথাটি ভুললে চলবে না।

দেখা যায়, প্রাচীন ভারতে গণিতচর্চায় কেরলের বিশিষ্ট স্থান

রয়েছে। এতে অবশ্য কেরলবাসীমাত্রেই আনন্দিত ও গর্বিত হবেন সন্দেহ নেই। কিন্তু ভারতের অন্যান্য রাজ্যের অধিবাসীদেরও এই আনন্দ ও গর্বে কম অংশ নেই। কেরল ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ—আমরা এক জাতি, একপ্রাণ।

নাম-গোত্র পরিচয়

চতুর্দশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার পরমেশ্বর। তিনি গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিজ্ঞানী। কেরালার দক্ষিণে মালাবার। এখানেই আলতুর নামে এক গ্রামে পরমেশ্বর সম্ভবত 1360 খ্রীস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ঋগ্বেদীয় ব্রাহ্মণ বলে তাঁর খ্যাতি ছিল। তাঁর গোত্রের নাম ছিল ভৃগু। তিনি যে-বাড়ীতে বসবাস করতেন তার সুন্দর একটি নাম ছিল। নীলা নদীর উত্তর তীরে তাঁর বাড়ী। নাম '**বটশ্রেণী**'।

ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে কিছু জানতে পারা না গেলেও পরমেশ্বরের দামোদর নামে একটি পুত্র ছিল। এবং এই পুত্রের জন্য তিনি অবশ্যই গর্ববোধ করতে পারেন। দামোদর পিতার মত ছিলেন গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিজ্ঞানী। দক্ষিণ ভারতের এক প্রখ্যাত গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিজ্ঞানী নীলকণ্ঠের ছিলেন তিনি গুরু।

পরমেশ্বরের গ্রন্থ থেকে জানা যায়, তিনি কোন কোন আচার্যদের নিকট পড়াশোনা করেছিলেন। যে তিন জন আচার্যের নাম জানা যায়, তাঁরা হলেন রুদ্র, নারায়ণ ও মাধব। তাঁর প্রথম গুরু ছিলেন রবি। আমরা আগেই নারায়ণ পণ্ডিতের কথা আলোচনা করেছি। পরমেশ্বরের গুরু কিন্তু এই নারায়ণ পণ্ডিত নন। ইনি অন্য নারায়ণ। তাঁর সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না।

রচনাপঞ্জী

অগাধ পাণ্ডিত্য ও জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন পরমেশ্বর। কম করেও তিনি তিরিশটি বই লিখেছেন। তার মধ্যে কিছু আছে মৌলিক গ্রন্থ, আবার কিছু ভাষ্য গ্রন্থ। বইগুলিকে মোট তিন ভাগে ভাগ করা

যায়ঃ এক, জ্যোতির্বিজ্ঞানের মৌলিক বই ; দুই, পূর্ববর্তী আচার্যদের রচিত গণিত-জ্যোতির্বিজ্ঞান বই-এর ভাষ্য ; এবং তিন, জ্যোতিষ গণনার বই। লক্ষ্য করার বিষয়, পরমেশ্বর জ্যোতিষ-গণনার বই লিখেছিলেন। প্রাচীন ভারতে জ্যোতিষচর্চা খুব জনপ্রিয়তা অর্জন করে। দেশ-কালের গণ্ডী অতিক্রম করে তখনকার গণিতাচার্যরা বিষয়টি উপেক্ষা করতে পারেননি। খুব সম্ভব, পেশা ও জীবিকার সঙ্গে এই জ্যোতিষচর্চা যুক্ত ছিল। যাই হোক, পরমেশ্বরের লেখা কয়েকটি বই-এর নাম উল্লেখ করা হলোঃ 1) দৃগ্‌গণিত, 2) গোলদীপিকা, 3) গ্রহণমণ্ডন, 4) ভটদীপিকা, 5) লঘুভাস্করীয়, 6) কর্মদীপিকা, 7) সিদ্ধান্ত-দীপিকা, 8) লঘুমানসের ভাষ্য ও বিবরণ ইত্যাদি।

'ভটদীপিকা' নাম থেকে সহজেই অনুমান করা যায় এটি আর্যভটের 'আর্যভটীয়' গ্রন্থের ভাষ্য ; 'লঘুভাস্করীয়' ও 'কর্মদীপিকা' প্রথম ভাস্কর রচিত বিখ্যাত গ্রন্থ দুটির ভাষ্য ; 'দৃগ্‌গণিত' ও 'গোলদীপিকা' তাঁর মৌলিক গ্রন্থ। এখনো তাঁর লেখা অনেক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও গ্রন্থাগারে পাণ্ডুলিপি আকারে পড়ে আছে। এটা খুবই দুঃখের বিষয়।

বিশিষ্টতা

হরিদত্তের আলোচনায় আমরা 'পরহিত' পদ্ধতির উল্লেখ করেছি। ওই পদ্ধতির সাহায্যে তিনি জ্যোতির্বিজ্ঞানে গবেষণা ও গণনার প্রভূত উন্নতি করে কীর্তি স্থাপন করেন। বিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রীদের জানা, মোটামুটি গণনায় সাধারণ বা ব্যবহারিক কাজ চলতে পারে, কিন্তু বিজ্ঞান ও গণিতে মোটামুটি হিসাব বা গণনার স্থান নেই। সেখানে চাই সূক্ষ্ম হিসাব ও গণনা। পরমেশ্বর সময় দেখা গেল জ্যোতির্বিজ্ঞানের গবেষণাগায় পর্যবেক্ষণের সঙ্গে গণনার মিল হচ্ছে না। সুতরাং নতুন ধরনের গণনা পদ্ধতি অপরিহার্য ও অত্যাবশ্যক হয়ে উঠল। প্রতিভাধর পরমেশ্বর স্বয়ং এই সঙ্কটের অবসানে এগিয়ে এলেন।

'পরহিত' পদ্ধতির সংস্কারে মনোনিবেশ করলেন তিনি। কিন্তু

কাজটি সহজ ছিল না। দীর্ঘ চোদ্দ বছর গভীর মনোনিবেশ ও অক্লান্ত পরিশ্রম করে নতুন পদ্ধতি আবিষ্কারে সফল হলেন পরমেশ্বর 1431 খ্রীস্টাব্দে। তিনি এই পদ্ধতির নামকরণ করলেন 'দৃগ্‌গণিত'। 'দৃগ্‌গণিত' আবিষ্কার তাঁর এক অবিস্মরণীয় কীর্তি। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, মূল দৃগ্‌গণিত আর পাওয়া যায় না—সম্ভবত অবলুপ্ত। তবুও পণ্ডিতরা অন্যান্য সূত্র থেকে এই পদ্ধতি উদ্ধার করতে পেরেছেন বলে দাবী করছেন।

পরমেশ্বর জীবিত ছিলেন দীর্ঘদিন। 55 বছর ধরে অক্লান্ত পরিশ্রম করে জ্যোতির্বিজ্ঞানের গবেষণা কার্য চালিয়ে যান তিনি। কেবল পড়াশোনা করে বই লেখেননি। পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার মাধ্যমে তথ্যাদি বিশ্লেষণ করে তবেই বই লেখেন। সেইজন্য তাঁর বইগুলি পণ্ডিতদের দ্বারা মহাসমাদৃত হয়।

বিজ্ঞান মানসিকতা

ভাবালুতা—এলোমেলো চিন্তা সাফল্য ও প্রতিষ্ঠায় বাধাস্বরূপ। বিজ্ঞান মানসিকতা সাফল্যের অন্যতম চাবিকাঠি। যে-কোন ঘটনা যেন-কোন বিষয়কে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে দেখা উচিত। তবেই সঠিক দৃষ্টিভঙ্গী লাভ করা যায়। অন্যথায় বিফলতা আসে, এমন দৃষ্টান্ত অপ্রতুল নয়। ভাবতে ভাল লাগে যে, যখন মধ্যযুগে কেবল চারদিকে অন্ধকার, তখন আমাদের দেশের কোন কোন গণিতজ্ঞ সঠিক বৈজ্ঞানিক মানসিকতার পূর্ণ অধিকারী ছিলেন। এ-বিষয়ে সবার আগে পরমেশ্বরের নাম মনে পড়ে। সে-যুগের বিচারে যে তিনি অনেকখানি এগিয়ে ছিলেন, তাতে সন্দেহ করার কোন কারণ নেই। তিনিই প্রথম বিজ্ঞান মানসিকতা সম্পর্কে স্পষ্ট করে বললেন।

তাঁর সুযোগ্য পুত্র দামোদর পিতার গবেষণা ও সবার ওপরে বিজ্ঞানমানসিকতা লক্ষ্য করতেন। তাই তিনি বড় জ্যোতির্বিদ হতে পেরেছিলেন। দামোদরের লেখা জ্যোতির্বিজ্ঞানের বই ছিল, কিন্তু এখন আর পাওয়া যায় না। দামোদরের প্রিয় শিষ্য নীলকণ্ঠ। ইনি

গুরুর প্রতি অসীম শ্রদ্ধা পোষণ করতেন এবং তাঁর বই থেকে নানা উদ্ধৃতিও তুলে ধরেছেন।

পারিবারিক ঐতিহ্য

পরমেশ্বর পরিবারে গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞানচর্চার ঐতিহ্য ছিল। পরমেশ্বরের পিতামহ ছিলেন জ্যোতির্বিদ। এই পরিবারের অন্তত তিন পুরুষে জ্যোতির্বিজ্ঞানচর্চার ঐতিহ্য দেখা যায়। সত্যি কথা বলতে, দক্ষিণ ভারতে গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞানচর্চা ক্রমশ পারিবারিক হয়ে ওঠে। এক একটি পরিবার ছিল যেন এক একটি প্রতিষ্ঠান বা বিদ্যালয়। ইউরোপে এরকম দু-একটি গাণিতিক পরিবারের কথা জানা যায় বটে, কিন্তু মধ্যযুগে ভারতের মত এমন ব্যাপক নয়। আমরা পরে এরকম কয়েকটি পরিবারের পরিচয় দেবো।

নীলকণ্ঠ সোময়াজী (প্রথম নীলকণ্ঠ)

পণ্ডিত ও মনস্বী ব্যক্তিদের কেবল একটি বা দুটি বিষয়েই গভীর জ্ঞান থাকে, তা নয়। নানা বিষয়ে গভীর জ্ঞানের অধিকারী হন তাঁরা। বিশ্বকোষসদৃশ জ্ঞানের উদাহরণ বর্তমানে দুর্লভ হয়ে পড়েছে। কারণ, এ যুগে জ্ঞানের যে বিস্ফোরণ হয়েছে, তাতে একটিমাত্র বিষয়েই গভীর জ্ঞানলাভ করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। কিন্তু প্রাচীনযুগে এমনটি ছিল না। তখন নানা বিষয়ে জ্ঞানলাভ সম্ভব হতো। প্রাচীন ভারতীয় গণিতাচার্যদের মধ্যে অন্তত দু-জনের নাম ইতিমধ্যে আমরা করেছি যাঁরা বহু বিষয়ে গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। প্রথম ভাস্কর, দ্বিতীয় ভাস্কর এরকম জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। নীলকণ্ঠ সোময়াজীকেও এঁদের মধ্যে গণ্য করা যায়। তিনিও বহু বিষয়ে অসামান্য জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। নীলকণ্ঠ নামে ভারতে একাধিক গণিতজ্ঞ রয়েছেন। আমাদের আলোচ্য নীলকণ্ঠ সময়ের বিচারে প্রথম নীলকণ্ঠ বলে পরিচিত।

কুল পরিচয়

নীলকণ্ঠ নামের সঙ্গে বেশ কয়েকটি পদবী যুক্ত হতে দেখা যায়। যেমন,—সোমযাজী, সোমসুত, সোমসুত্বন ইত্যাদি। কেরালা রাজ্যের কুণ্ডপুর বা কুণ্ডগ্রামে 1443 খ্রীস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন তিনি। নীলকণ্ঠ দীর্ঘজীবন লাভ করেন—প্রায় একশ' বছর।

গার্গ-গোত্রীর ভট্ট ব্রাহ্মণ ছিলেন তিনি। তাঁর পিতার নাম জাতবেদ, খুল্লতাতের নামও তাই। তাঁর স্ত্রীর নাম আর্যা; রাম ও দক্ষিণমূর্তি নামে তাঁর দুইটি পুত্র ছিল। তাঁর এক ভায়ের নাম শঙ্কর।

নাম্পুতিরি ব্রাহ্মণদের বাড়ীর নাম **'ইলাম'**। তাঁর ইলামের নাম 'কেরাল্লুর'। নীলকণ্ঠের নামের আগে প্রায়শ 'গার্গ-কেরল' লেখা দেখা যায়। এই কেরল কিন্তু রাজ্যের নাম নয়—বাড়ীর নাম। এখন বাড়ী তৈরী করে অনেকে সুন্দর সুন্দর নামকরণ করেন। দেখা যাচ্ছে বাড়ীর নামকরণ কেবল এ-যুগেই নয়, সেই প্রাচীন যুগেও ছিল। পাঁচ-ছ'শ' বছর আগে যে ছিল তা তো পরমেশ্বর ও নীলকণ্ঠের বাড়ীর নামকরণ থেকেই বোঝা যাচ্ছে।

নেত্রনারায়ণ নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন নীলকণ্ঠের প্রধান পৃষ্ঠপোষক। ইনি কেরলের নাম্পুতিরি ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের প্রধান ছিলেন। তিনি ছিলেন নীলকণ্ঠের উৎসাহদাতা। তাঁর সঙ্গে নানা জটিল বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেন নীলকণ্ঠ। কেরলের ইতিহাসে নেত্রনারায়ণ পরিবারের বিশিষ্ট স্থান। এই পরিবারে বহু পণ্ডিত, জ্ঞানী মানুষ জন্মেছিলেন। তাঁরা সকলেই বিদ্যা ও গুণের সমাদর করতেন। বলা বাহুল্য, নেত্রনারায়ণ পরিবারের সংস্পর্শে এসে নীলকণ্ঠ তাঁর বহুমুখী প্রতিভা বিকাশের সুযোগ পেয়েছিলেন।

নীলকণ্ঠের প্রথম গুরুর নাম রবি। তাঁর কাছে বেদান্ত ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রথম পাঠ নেন। কিন্তু সত্যিকার জ্যোতির্বিজ্ঞানের শিক্ষা দৃগ্‌গণিতের আবিষ্কারক পরমেশ্বরের পুত্র দামোদরের কাছে। অবশ্য গুরুর গুরু পরমেশ্বরের কাছেও সামান্য পাঠ গ্রহণ করার সৌভাগ্যে

তাঁর হয়। অনুমিত হয়, নীলকণ্ঠের পাঠগ্রহণের সময় পরমেশ্বর বৃদ্ধ হয়ে পড়েছিলেম। তাই তিনি না পড়ালেও সঠিক নির্দেশ ও উপদেশ দিয়ে থাকবেন।

শ্রদ্ধা ঃ এ-যুগ সে-যুগ

আচার্য দামোদরের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করতেন নীলকণ্ঠ। এই শ্রদ্ধার অর্ঘ্য তাঁর গ্রন্থে লিপিবদ্ধ থাকতে দেখা যায়। কেবল গুরুর প্রতিই নয়, গুরুর গুরু পরমেশ্বরের প্রতিও ছিল তাঁর অসীম শ্রদ্ধা। গুরুর প্রতি এরূপ শ্রদ্ধার উদাহরণ খুব কমই দেখা যায়। অবশ্য আধুনিক যুগে একটিমাত্র উদাহরণ দেখা যায়। পাকিস্তানের পদার্থবিজ্ঞানী ডঃ আব্দুস সালাম নোবেল পুরস্কার পাবার পর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মান ও শ্রদ্ধা জানান। কিন্তু এই সম্মান গ্রহণের সময় তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে তাঁর প্রাক্তন গণিত শিক্ষক অনিলেন্দু গাঙ্গুলি মহাশয়কেও সম্মানিত করার জন্য বলেন। এ-যুগের পরিপ্রেক্ষিতে এরকম দৃষ্টান্ত বিরল বললেই চলে।

ষড়-দর্শন-পারঙ্গত

নীলকণ্ঠের নানা বিষয়ে গভীর পাণ্ডিত্যের কথা উল্লেখ করেছি। অনেকের জানা, ভারতীয় দর্শন খুবই উন্নত মানের, বিশ্বে খ্যাতিও কম নয়। সত্যিই প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ তার দর্শন। প্রাচীন ভারতীয় দর্শন একটিমাত্র নয়, অনেক। যে বিভিন্ন প্রকারের দার্শনিক মতবাদ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ তাদের ছ'টি ভাগে ভাগ করা হয়। এদের ষড়দর্শন বলে। ভারতীয় দর্শন ও সংস্কৃতিতে নীলকণ্ঠের গভীর জ্ঞান ছিল বলে তাঁকে 'ষড়-দর্শন-পারঙ্গত' উপাধি দেওয়া হয়। কেবল ষড়দর্শনেই নয়, আরো বহু বিষয়ে তাঁর পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন, তাঁর গ্রন্থসমূহে মীমাংসা, ছন্দসূত্র ব্যাকরণ, অভিধান, পুরাণ ইত্যাদি থেকে উদ্ধৃতি দেখা যায়। জ্যোতির্বিজ্ঞানে তাঁর অসামান্য পাণ্ডিত্য লক্ষ্য করার মত। প্রাচীন

ভারতের বহু গ্রন্থের নাম তাঁর লেখায় পাওয়া যায়। বেদাঙ্গ জ্যোতিষ, আর্যভটীয়, পঞ্চসিদ্ধান্তিকা, বৃহজ্জাতক, বৃহৎসংহিতা, গোবিন্দস্বামীন, পরমেশ্বর, দামোদর, লঘুমানস ইত্যাদি থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে তাঁর পাঠের ব্যাপ্তি দেখিয়েছেন।

লক্ষণ ভাই

শঙ্কর ছিলেন নীলকণ্ঠের ছোট ভাই। রামানুজ লক্ষণের মতই ছিল তাঁর গুণাবলী। নীলকণ্ঠ তাঁর আর্যভটীয় ভাষ্যের অনেক জায়গায় শঙ্করের নাম উল্লেখ করেছেন। শঙ্কর সর্বদাই দাদাকে তাঁর গবেষণায় সাহায্য করতেন, এবং তাঁর মত ও পথ অনুসরণ করতেন। শঙ্কর গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের অধ্যাপনায় ব্যস্ত থাকতেন। তা ছাড়া তিনি নেত্র-নারায়ণের গৃহে শিক্ষকতাও করতেন বলে জানা যায়। নীলকণ্ঠের আর্যভটীয় গ্রন্থের ভাষ্যের নীতি ও পদ্ধতি প্রচার করতেন শঙ্কর, ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে অগ্রজের মতাদর্শ অবলম্বন করতেন।

সুপুত্রের পিতা

পরমেশ্বর যেমন সুপুত্র লাভ করেছিলেন, তেমনি নীলকণ্ঠও তাঁর দুই পুত্রের জন্য গর্ববোধ করতে পারতেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র রাম ছিলেন পিতার মতই গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিজ্ঞানী। কনিষ্ঠ পুত্র দক্ষিণামূর্তি নানা ধর্মশাস্ত্রে পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। তা ছাড়া সংস্কৃত, তামিল ও মালায়ালম ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। পিতার বহুমুখী প্রতিভা যেন দুই ধারায় দুই পুত্রের মধ্যে প্রবাহিত হয়েছিল। আর একটি আশ্চর্যের কথা এই যে, নীলকণ্ঠের মত গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিজ্ঞানীর এক শিষ্য মালায়ালম ভাষায় সুখ্যাত কবি হিসাবে পরিচিত হয়েছিলেন। এই শিষ্যের নাম তুঞ্চত্তু।

বন্ধুপ্রীতি

নীলকণ্ঠের বন্ধুপ্রীতি ছিল অসাধারণ। অনেক রচনায় সুব্রহ্মণ্য নামে তাঁর এক বন্ধুর নাম পাওয়া যায়। এমন কি এক বন্ধুর অনুরোধে

কোচিনের উরকম মন্দিরের দেবী পার্বতীর উদ্দেশ্যে মালায়ালম ভাষায় একটি স্তোত্রও রচনা করেন। ওই স্তোত্র যপ করলে নাকি তাঁর বন্ধুর কন্যার অকাল মৃত্যু রোধ হবে। কি জানি, এই স্তোত্র জপ করে তাঁর বন্ধুর কন্যার অকাল মৃত্যু রোধ হয়েছিল কিনা। কিন্তু এটা যে অনন্য-সাধারণ ও অসাধারণ ব্যক্তিদের নিয়ে গল্প কাহিনী গড়ে ওঠে তার একটা উদাহরণ, তাতে সন্দেহ করার খুব জোরালো কারণ নেই।

শতাধিক বছর জীবিত ছিলেন নীলকণ্ঠ। তাঁর জন্ম 1443 খ্রীস্টাব্দ আর মৃত্যু 1545 খ্রীস্টাব্দ। দীর্ঘ জীবনে তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করেন। তবে বেশীর ভাগই জ্যোতির্বিজ্ঞান সংক্রান্ত বই। এখনো তাঁর লেখা সব বই আবিষ্কৃত হয়নি। সব পাওয়া গেলে হয়তো তাঁর ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানতে পারা যাবে, এবং তাঁর গণিতচর্চা সম্পর্কেও নতুন তথ্য জানা যেতে পারে।

রচনা ও কৃতিত্ব

আগেই বলেছি, তাঁর লেখা অধিকাংশ গ্রন্থই জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক। এখানে সব বই-এর নাম দেওয়া সম্ভব নয়, মাত্র কয়েকটি নাম দেওয়া হলো। 'গোলসার', 'সিদ্ধান্তদর্পণ', 'ছায়া গণিত', 'তন্ত্রসার সংগ্রহ' 'মহাভাষ্য', 'গ্রহণ নির্ণয়' ইত্যাদি।

বিশুদ্ধ গণিতের দিক থেকে বিচার করলে তাঁর মহাভাষ্য খুবই মূল্যবান। এটি মৌলিক গ্রন্থ নয়, আর্যভটীয় গ্রন্থের ভাষ্য। নীলকণ্ঠের দেওয়া মহাভাষ্য নামটি নানা কারণে খুবই সার্থক হয়েছে। অনেকবার বলেছি, আর্যভটীয় ছোট হলেও খুবই জটিল ও দুরূহ প্রকৃতির। মনে হয়, আর্যভট বইটি সাধারণের জন্য লেখেনি—বিদ্বান ও পণ্ডিতদের জন্য লিখেছিলেন। নীলকণ্ঠ এই জটিল গ্রন্থের মর্মে প্রবেশ করতে পেরেছিলেন। তাই তাঁর মহাভাষ্যে সহজ সরল অথচ সুন্দর ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। এটা কম কৃতিত্বের কথা নয়। গণিতে গভীর জ্ঞান ও মৌলিক প্রতিভা না থাকলে এমন সম্ভব নয় বলে মনে হয়।

আর্যভট ও নীলকণ্ঠের মধ্যে সময়ের ব্যবধান সামান্য নয়—প্রায়

হাজার বছরের। এই এক হাজার বছরের মধ্যে ভারতে বহু গণিতজ্ঞ জন্মগ্রহণ করেছিলেন, আর তাঁদের অনেকের মৌলিক প্রতিভার অভাব ছিল না। কিন্তু তাঁদের কেউ আর্যভটের গ্রন্থের জটিলতা দূর করার চেষ্টা করেননি। অবশ্য ব্রহ্মগুপ্ত বা ভাস্করাচার্যের পক্ষে এনিয়ে চিন্তা করার অবসর ছিল না। কারণ, তাঁরা ছিলেন প্রকৃতপক্ষে সৃজনশীল গণিতজ্ঞ। নিজেদের গবেষণা ও নানা সমস্যামূলক চিন্তায় তাঁরা সর্বদা মগ্ন থাকতেন। তা ছাড়া তাঁরা অপরের গ্রন্থের টীকাভাষ্যও লেখেননি। কিন্তু অপর গণিতজ্ঞ ও ভাষ্যকাররা এ বিষয়ে লিখতে পারতেন। অবশ্য সে প্রচেষ্টা যে হয়নি, তা নয়। প্রথম ভাস্কর থেকে শুরু করে পরমেশ্বর পর্যন্ত কেউ কেউ করেছেন। তাঁদের ভাষ্যের অন্য মূল্য থাকলেও আর্যভটীয়-এর জটিলতা ও দুরূহতা সম্পূর্ণ বিদূরীত হয়নি। এই কাজটি করলেন নীলকণ্ঠ। আমরা সেইজন্য তাঁর নিকট ঋণী। যাই হোক, নীলকণ্ঠ কিভাবে জটিলতা দূর করলেন তার একটি উদাহরণ দেওয়া যাক।

আর্যভট আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা পাই (π)-এর মান নির্ণয়ে তাঁর কৃতিত্বের কথা বলেছি। তিনি পাই-এর মান নির্ণয় করে বলেছেন, এটি আসন্ন মান, সূক্ষ্মতম মান নয়। কেন তিনি (আসন্ন) কথাটি বললেন তার কোন ব্যাখ্যা দেননি এবং পরবর্তী গণিতজ্ঞরাও এ-সম্পর্কে কোন মন্তব্য করেননি। কিন্তু ব্রহ্মগুপ্ত, ভাস্করাচার্য প্রমুখ গণিতজ্ঞরা 'পাই' নিয়ে আলোচনা করেছেন। তবে সবাই নিজ নিজ মতে ও পথে পাই-এর মান দিয়েছেন। নীলকণ্ঠ সর্বপ্রথম আর্যভট কথিত 'আসন্ন' মানের ব্যাখ্যা দিলেন।

পাই (π) হচ্ছে বৃত্তের পরিধি ও ব্যাসের অনুপাত অর্থাৎ পাই (π) $= \frac{\text{পরিধি}}{\text{ব্যাস}}$। নীলকণ্ঠ প্রশ্ন উত্থাপন করে ব্যাখ্যা করেছেন—"প্রকৃত মানের পরিবর্তে কেন এখানে আসন্ন মান দেওয়া হয়েছে? আমি ব্যাখ্যা করব। কারণ, প্রকৃত মান দেওয়া যাবে না। যে-মানে ব্যাস-পরিমাপ করলে ভাগশেষ থাকে না, সে-মানে পরিধি পরিমাপ করলে নিশ্চিত

ভাগশেষ থাকে। একইভাবে যে-এককে পরিধি পরিমাপ করলে ভাগশেষ থাকে না, সে-এককে ব্যাস পরিমাপ করলে আবার ভাগশেষ থাকে। প্রক্রিয়াটির বারবার সম্পাদনে আমরা ক্ষুদ্রতম ভাগশেষ পেতে পারি বটে, ভাগশেষবিহীন হবে না।”

আর্যভট বৃত্তের ক্ষেত্রফলের সূত্র দিয়েছেন $\frac{1}{2}\cdot \text{পরিধি}\cdot \frac{\text{ব্যাস}}{2}$ কিন্তু কিভাবে আর্যভট এই সূত্রটি পেলেন তার ব্যাখ্যা আর্যভটীয়তে নেই। তা দিয়েছেন নীলকণ্ঠ।

নীলকণ্ঠ পরম ধর্মপরায়ণ ছিলেন। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পরিবারে তাঁর জন্ম, নেত্রনারায়ণের মত সৎ ব্রাহ্মণের স্নেহ ভাজন হওয়ায় ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে তাঁর বিশ্বাস ও ভক্তি ছিল। তাঁর প্রিয় দেবতা হলেন দেবাদিদেব মহাদেব। তাঁর গ্রামের নিকটেই শ্রীশ্বেতারন্য মন্দির ছিল। এই মন্দিরে অধিষ্ঠিত ছিলেন মহাদেব। নীলকণ্ঠ গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের মত সূক্ষ্ম যৌক্তিক জালে আবদ্ধ যথার্থ বিজ্ঞানের গবেষণায় মগ্ন ছিলেন বটে, তবুও ধর্মে তাঁর অটুট বিশ্বাস ছিল, আবার অনুষ্ঠানেও শ্রদ্ধা ছিল। নিউটনের মত মহাবিজ্ঞানীও শেষ বয়সে ধর্মচর্চা করেছেন, আচার অনুষ্ঠান মেনে চলেছেন। বলা হয়, প্রকৃত ধর্মে ও বিজ্ঞানে কোন বিরোধ নেই। অবশ্য এযুগের বিজ্ঞানমানসিকতায় এই বিশ্বাসে চিড় ধরেছে।

আমরা আগেই বলেছি, মধ্যযুগে পৃথিবীর সর্বত্র অবক্ষয় সূচিত হয়। মধ্যযুগে উত্তর ভারতে জ্ঞান-বিজ্ঞানচর্চা প্রায় সম্পূর্ণ স্তব্ধ হয়ে যায়। তখন দক্ষিণ ভারতের সুদূর মালাবার উপকূলে কুণ্ডগ্রামে এই মহান আচার্য যে জ্ঞানের দীপ শিখা জালিয়ে রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন, সেইজন্য ভারতবাসী মাত্রেই শ্রদ্ধায় অবনত মস্তকে তাঁকে স্মরণ করবেন, এবং গৌরব ও গর্ববোধ করছেন, সন্দেহ নেই।

শুভঙ্কর

বিভূতিভূষণের পথের পাঁচালির অপুর পাঠশালার বিবরণ অনেকের জানা। পাঠশালা বাংলাদেশের শিক্ষা ও শিক্ষাবিস্তারে সুদীর্ঘকাল

ধরে অসামান্য ভূমিকা পালন করে এসেছে। এমন কি, তিরিশ বছর আগে অন্তত যাঁরা পড়াশোনা করেছেন, তাঁরা অনেকেই হাতে খড়ি দিয়েছেন পাঠশালায়। তখন পাঠশালায় যে সব অঙ্ক করতে হতো, তাতে শুভঙ্করীর স্থান ছিল সবার ওপরে। বস্তুত তখন অঙ্ক কষা মানেই শুভঙ্করী কষা। শুভঙ্করী কষতে গেলে কিছু কিছু নিয়ম মুখস্থ করতে হতো। এই নিয়মগুলির নাম ছিল আর্যা, শুভঙ্করের আর্যা। শুভঙ্কর নামে কোন গণিতজ্ঞ বা লেখকের রচনা। এর ভাষা সঠিক বাংলা বলেই মনে হয়। তবে এতে অপভ্রংশের মিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়।

আমাদের দেশে যখন পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে শিক্ষা প্রচলিত হয়, তখন বিভিন্ন বিষয়ে পাঠ্যপুস্তক প্রকাশিত হতে থাকে। বাংলা ভাষায় প্রথম যে বিজ্ঞান বিষয়ক বইটি প্রকাশিত হয়, সেটি অঙ্কের বই। নাম 'অঙ্কপুস্তকং'। এই বইটির সঙ্কলক ও সম্পাদক রবার্ট মে। তারপর জন হার্লে নামে অপর এক মিশনারীর লেখা অঙ্কের বই প্রকাশিত হয়। বইটির নাম 'গণিতাঙ্ক'। 1840 সালের মধ্যে মাত্র চারটি বই প্রকাশিত হয়। প্রথম দুটির নাম বলেছি, অপর দুটির নাম 'বাংলা অঙ্ক পুস্তক' ও 'শিশুসেবধি—গণিতাঙ্ক'। এই চারটি বই-এ শুভঙ্করের বহু আর্যা দেখা যায়। এমন কি উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগেও শুভঙ্করী নামে অনেক বই প্রকাশিত হতে থাকে।

এই আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে, শুভঙ্করের আর্যা খুবই প্রসিদ্ধ ও প্রচলিত ছিল। তাঁর পরে অন্যান্য বহু লেখক আর্যা রচনা করতে থাকেন। এখানে একটি আর্যা উল্লেখ করা হলো এইজন্য যে, আধুনিক অনেক পাঠক আর্যা কেমন ছিল জানেন না।

"ক্রমাবন্দির আর্য্যা"

"জমী বিঘা যত তঙ্কা হইবেক দর।
তঙ্কা প্রতি ষোল গণ্ডা কাঠা প্রতি ধর।
যত আনা তত গণ্ডা পাই প্রতি বট।
গণ্ডা প্রতি ষোল তিল ঘুচাও কপাট।

কড়া প্রতি চারি তিল শুভঙ্কর ভনে।
ক্রমাবন্দী কর শিশু আনন্দিত মনে ॥"

বলা বাহুল্য, দু-একটি শব্দ ছাড়া এই আর্যার ভাষা তেমন পুরোনো নয়। তা ছাড়া এতে পুরোনো বাংলার ছাপ থাকলেও অপভ্রংশের তেমন ছাপ দেখা যায় না।

প্রাচীন ভারতের যে-সব গণিতজ্ঞদের কথা বলেছি, তাঁদের সবাই উত্তর ভারত ও দক্ষিণ ভারতের কোন-না-কোন রাজ্যের অন্তর্গত। ভারতের পূর্বাঞ্চলের কোন গণিতজ্ঞের কথা আমাদের জানা নেই যিনি মূল ভারতীয় গণিতপ্রবাহে গতিসঞ্চার করতে পেরেছিলেন। আরো দুঃখের কথা, আধুনিক যুগের আগে বাঙালীর গণিতে আগ্রহ ও অনুরাগও দেখা যায় না। তা হলে প্রশ্ন ওঠে, বাংলা দেশের শিক্ষার্থীরা কি গণিত পড়ত না? এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেওয়া কঠিন। কারণ, বাংলা ভাষার জন্মের পর থেকে দীর্ঘদিন ধরে এ ভাষায় লেখা কোন গণিত-গ্রন্থ পাওয়া যায় না। তবে ইংরেজী শিক্ষা প্রচলনের আগে ভাস্করাচার্যের 'সিদ্ধান্ত শিরোমণি'-র কিছু কিছু অংশ পড়ানো হতো, তার প্রমাণ আছে। এমন কি, সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠা হওয়ার পরও ভাস্করাচার্যের বই পড়ানো হতো। কিন্তু আর্যভটের 'আর্যভটীয়', ব্রহ্মগুপ্তের 'ব্রহ্ম-স্ফুট-সিদ্ধান্ত' এদেশে জনপ্রিয়তা অর্জন করেনি। তবে বরাহমিহিরের জ্যোতিষের প্রভাব কম ছিল না। বাংলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য কাব্য-সাহিত্য ও অন্যান্য ক্ষেত্রে বৈশিষ্ট্যসূচক হলেও এই সংস্কৃতির জীবনীশক্তি তেমন প্রবল নয়। খুব সম্ভব আর্যসভ্যতার অনুপ্রবেশ এ-দেশে অনেক পরে ঘটেছে বলে এ-রকম হয়েছে। যাই হোক, গণিত নিয়ে কিছু চিন্তা-ভাবনা যে বাঙালী করেছেন, তাঁর নাম শুভঙ্কর।

পরিচয়

শুভঙ্করের সঠিক পরিচয় জানা যায় না। পণ্ডিতদের মতে, তিনি বাঁকুড়া জেলার পলাশডাঙার নিকটবর্তী রসপুর গ্রামে 1009 সালে

জন্মগ্রহণ করেন। অবশ্য এ-নিয়ে নানা মুনির নানা মত। কেউ বলেন, তিনি 24 পরগনা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন, আবার কেউ বলেন, তিনি নদীয়া বা বর্ধমান জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তবে তিনি বিষ্ণুপুরের রাজা গোপাল সিংহের দরবারে উপস্থিত থাকতেন ও রাজার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন,—এ বিষয়ে অনেক পণ্ডিত এক মত পোষণ করেন। রাজা গোপাল সিংহের রাজত্বকাল 1720 থেকে 1750 খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত। সুতরাং শুভঙ্কর ওই সময়ে অর্থাৎ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষে বা অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমে কোন সময় জন্মগ্রহণ করে থাকবেন। শুভঙ্করের কন্যার বংশধর শ্যামাচরণ বরাটের গৃহে শুভঙ্করের অসম্পূর্ণ জীবনী থেকে জানা যায় যে, তিনি বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর পরগণার অন্তর্গত রামপুর গ্রামে 1009 সালে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু এই 1009 সাল নিয়ে বড় বিতর্ক। এটি কি বাংলা সাল বা মল্ল সাল? বাংলা সাল ধরলে শুভঙ্করের জন্ম সাল 1602/3 খ্রীস্টাব্দ হয়। কিন্তু ওই সময় গোপাল সিংহ জন্মগ্রহণই করেননি। অবশ্য ওই সময় ষোড়শ শতাব্দীর শেষের দিকে একজন বাঙালী সঙ্গীতাচার্য ছিলেন যাঁর নাম শুভঙ্কর। 'সঙ্গীত দামোদর' তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ। তিনি কি এই শুভঙ্কর হতে পারেন?

শুভঙ্করের পদবী কি?

'সঙ্গীত দামোদর' রচয়িতা শুভঙ্করের পদবী লাহিড়ী। তিনি ব্রাহ্মণ। কিন্তু আমাদের 'আর্যা' রচয়িতা শুভঙ্করের পদবী কোথাও লাহিড়ী বলে উল্লিখিত হয়নি। তাঁর পাদবী 'দাস', 'রায়', বা 'দাসগুপ্ত' বলে পণ্ডিতরা বলেন। এমন কি, তাঁর আসল নাম নাকি শুভঙ্কর ছিল না,—ছিল জগন্নাথ বা ভৃগুরাম। শুভঙ্কর নামটি নাকি বিষ্ণুপুর রাজের প্রদত্ত। যাই হোক, শুভঙ্কর নামেই তাঁর পরিচয়। যাঁরা মাঝ বয়সী, তাঁরা অনেকেই শুভঙ্করের 'আর্যা'-র সাহায্যে 'মণকষা', 'সেরকষা', 'সুদকষা' ইত্যাদি করেছেন। এখানে সে-বিষয়ে সামান্য উল্লেখ আগেই করা হয়েছে।

অচ্যুত পিষারতি

উত্তর ভারতে কুসুমপুর ভারতের গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে একটি স্মরণীয় নাম। বেশ কয়েক শতাব্দী ধরে কুসুমপুর সর্বভারতীয় খ্যাতি অর্জন করেছিল। দক্ষিণ ভারতে তেমনি একটি নাম কুণ্ডপুর। এখানে নীলকণ্ঠের জন্মস্থান, আবার অচ্যুতও এই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। 'পিষারতি' শব্দটি বিশেষ অর্থে প্রয়োগ করা হয়। কেরালা রাজ্যের মন্দিরসমূহে যাঁরা পূজা-অনুষ্ঠানের জন্য মন্দিরের ভেতরে কাজ-কর্ম না করে বাইরে করেন, তাঁদের 'পিষারতি' বলা হয়। অচ্যুত এই বিশেষ সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন বলে তাঁর পদবী 'পিষারতি' বলে অনুমান করা হয়। আনুমানিক 1550 খ্রীস্টাব্দে তাঁর জন্ম।

গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞানে অচ্যুতের বিশেষ কৃতিত্ব লক্ষ্য করার মত। পূর্ববর্তী কোন কোন জ্যোতির্বিজ্ঞানী যেমন হরিদত্ত, পরমেশ্বর প্রমুখের মত তিনিও বিশেষ একটি পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। ইউরোপে বিখ্যাত টাইকো ব্রাহেও এই পদ্ধতি আবিষ্কার করেন।

আচার্য জ্যেষ্ঠ দেবের নিকট অচ্যুত অধ্যয়ন করেন। সেই সময় ওই রাজ্যে গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিদ হিসাবে জ্যেষ্ঠ দেবের খ্যাতি ও প্রতিপত্তি ছিল। 'যুক্তিভাষা' গ্রন্থে তিনি আধুনিক গণিতের অনেক সূত্রের কথা বলেছেন।

বিচিত্র প্রতিভা—আদর্শ শিক্ষক

নীলকণ্ঠের মত অচ্যুতও বহু বিষয়ে গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। ব্যাকরণ, ছন্দ, অলঙ্কার এবং গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞানে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। সেইজন্য রাজানুগ্রহলাভে তিনি বঞ্চিত হননি। রাজা রবি বর্মা তাঁকে সাহায্য করতেন এবং তাঁর পৃষ্ঠপোষকও ছিলেন।

আদর্শ শিক্ষক খুব কম দেখা যায়। শুধু বিষয়-জ্ঞান থাকলেই আদর্শ শিক্ষক হওয়া যায় না। শিক্ষায় উৎসাহ প্রদান, শিক্ষার্থীকে প্রবণতা অনুযায়ী পথ প্রদর্শন করতে না পারলে শিক্ষা ব্যর্থ হয়। অচ্যুত ছাত্রদের উৎসাহ দিতেন; জ্ঞানার্জনে সহায়তা ও জানার আগ্রহ

ও কৌতূহল সঞ্চার করায় তাঁর সমকক্ষ কাউকে খুঁজে পাওয়া ভার। অচ্যুত ছিলেন আদর্শ শিক্ষক। তিনি নিজে যত না বিখ্যাত তাঁর ছাত্ররা তাঁর চেয়েও বেশী বিখ্যাত হতে পেরেছিলেন।

কেরালার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি নারায়ণ ভট্টতিরি ছিলেন তাঁর শিষ্য। নারায়ণ তাঁর কাছে ব্যাকরণ শিক্ষা করেন। এবং পরে বহু গ্রন্থ রচনা করেন। কবি নারায়ণের লেখা থেকে জানতে পারা যায় যে, গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞানে অচ্যুতের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল। তা ছাড়া অলঙ্কার ও চিকিৎসাবিজ্ঞানেও তিনি পারদর্শী ছিলেন।

তাঁর শিষ্যদের মধ্যে দুটি ভাগ দেখা যায়। কাব্য-সাহিত্যের ছাত্র, আর গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের ছাত্র। জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁর ছাত্ররা অনেকেই যে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন, তার প্রমাণ এখানো দেখা যায়। শিষ্য বা ছাত্রের সম্মান ও খ্যাতিতে গুরুর খ্যাতি ও সম্মান বৃদ্ধি পায়। এক্ষেত্রে তেমনই হয়েছিল।

অচ্যুত পিষারতির গ্রন্থ সংখ্যা প্রায় দশ-বারোখানি। 'প্রবেশক' নামে তাঁর লেখা বইটি আবার ব্যাকরণের বই। ব্যাকরণের নবীন শিক্ষার্থীর জন্য বইটি লেখা। বলা যেতে পারে, এটি ছোটদের উপযোগী করে লেখা।

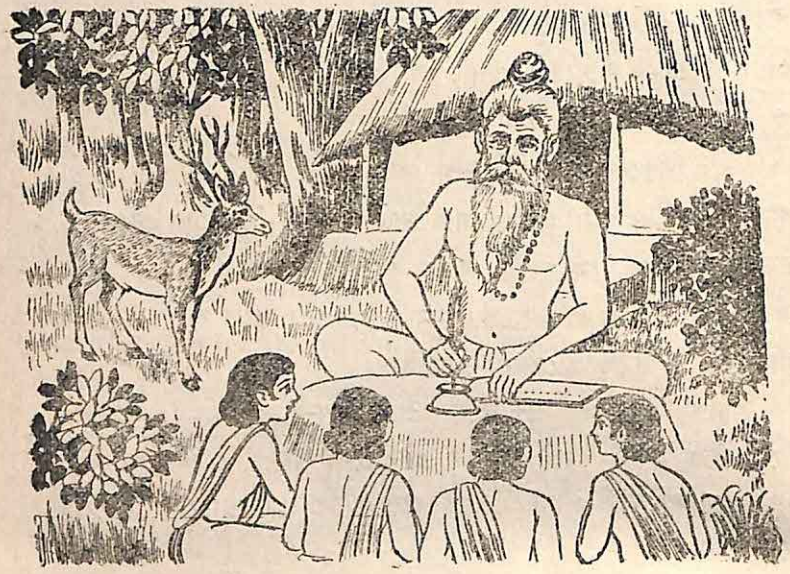
তাঁর জ্যোতির্বিজ্ঞানের বইগুলির মধ্যে আছে 'স্ফুটনির্ণয়তন্ত্র,' ও 'রাশি গোল স্ফুটনীতি'। প্রথম বইটি ছ'টি অধ্যায়ে বিভক্ত।

পরিণত বয়সেই তাঁর মৃত্যু হয়। ওই সময় তিনি সম্মান ও যশের উচ্চ শিখরে আসীন ছিলেন। প্রাচীন ভারতের বহু গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিদের জন্ম ও মৃত্যু তারিখ নিশ্চিত রূপে জানা যায় না। কিন্তু অচ্যুতের মৃত্যু তারিখ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। 1621 সালে তাঁর মৃত্যু হয়।

কয়েকটি গণিতজ্ঞ পরিবার

ডাক্তারের ছেলে ডাক্তার, উকিলের ছেলে উকিল, ইঞ্জিনিয়ারের ছেলে ইঞ্জিনিয়ার হবে, এমন কথা বলা যায় না। বরং বহু ক্ষেত্রে এর

উল্টো দেখা যায়। আসলে বুদ্ধি, মেধা ও প্রবণতা অনুসারে মানুষ পড়াশোনা করে ও বৃত্তি বেছে নেয়। তবে সব সময় আবার এটাও সম্ভব হয় না। বুদ্ধি-মেধা-প্রবণতা অনুসারে মানুষ পড়াশোনা ও বৃত্তি নির্বাচন করতে পারে না।



গণিতের ইতিহাসে কিন্তু একটি আশ্চর্য ঘটনা লক্ষ্য করা যায়। ঘটনাটি হলো, একই পরিবারে অনেক গণিতজ্ঞের আবির্ভাব। আশ্চর্য ও অসম্ভব বলে অনেকে মনে করতে পারেন। বুদ্ধি দিয়ে এর ব্যাখ্যা করা যায় না। গণিতজ্ঞের ছেলে গণিতজ্ঞ, তার ছেলে আবার গণিতজ্ঞ ইত্যাদি কি করে সম্ভব? তবে মনে হয়, পারিবারিক ঐতিহ্য এসব ক্ষেত্রে কার্যকর হয়েছে।

ইউরোপে উদাহরণ

আমাদের দেশে চতুর্দশ শতাব্দী থেকে ষোড়শ শতাব্দীর ভেতরে এমন পাঁচ-ছ'টি পরিবার দেখা যায় যেখানে পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে গণিতচর্চা

অব্যাহত ছিল। ইউরোপে এরকম একটিমাত্র পরিবারের কথা জানা যায়। ওই পরিবারের নাম 'বারনুলি পরিবার'। এই পরিবারে কম করেও দশ-বারো জন গণিতজ্ঞের নাম পাওয়া যায়। তাঁদের প্রত্যেকেরই গণিতে কিছু-না-কিছু অবদান রয়েছে।

বারনুলিদের গণিতজ্ঞ হওয়ার ব্যাপারে একটি মজার ঘটনা লক্ষ্য করা যায়। এমন দেখা যায় যে, ওই পরিবারের কোন কর্তা হয়তো দেখলেন তাঁর ছেলের গণিতের প্রতি আকর্ষণ। কিন্তু এটা তাঁর পছন্দ নয়। তিনি চাইলেন ছেলে ডাক্তার বা উকিল বা ধর্মতত্ত্বে বিশেষজ্ঞ হোক। এবং সেইভাবেই তার পড়াশোনার ব্যবস্থা করা হলো। বাধ্য হয়ে ছেলে পিতার পছন্দ মত বিষয় নিয়ে পড়ল। কিন্তু বড় হয়ে সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে গণিত নিয়ে মেতে উঠলেন, এবং বড় গণিতজ্ঞ হয়ে উঠলেন।

ঐতিহ্য ও বৈশিষ্ট্য

যাই হোক, আমরা এখানে কয়েকটি পরিবারের কথা আলোচনা করছি যে পরিবারে একাধিক গণিতজ্ঞ বর্তমান ছিলেন, এবং তাঁরা ভারতের গাণিতিক ঐতিহ্য পুত্র-পৌত্র, শিষ্য-প্রশিষ্যের মাধ্যমে বজায় রাখার প্রয়াস পেয়েছিলেন।

কিন্তু তার আগে প্রাসঙ্গিক দু-একটি বিষয় আমাদের জেনে নেওয়া দরকার। আমরা যে ভারতীয় গণিতজ্ঞ পরিবারের কথা আলোচনা করব তাতে দেখা যায় উত্তর ভারতে এই রকম গণিতজ্ঞ পরিবারের সংখ্যা বেশী নয়। বেশীর ভাগ পরিবার পশ্চিম ও মধ্যভারতে অবস্থিত। আর সব পরিবারই ব্রাহ্মণ পরিবার, অব্রাহ্মণদের স্থান নেই। সত্যি কথা বলতে কি, সেই প্রাচীন বৈদিক যুগ থেকে আরম্ভ করে এই কিছুদিন পর্যন্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান, সভ্যতা-সংস্কৃতিচর্চায় ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য। তাঁরাই ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতি-ঐতিহ্যের জনক, ধারক ও বাহক; অবশ্য অতি সম্প্রতি এই ধারার ও রীতির কিছু কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। অব্রাহ্মণেরাও এখন জ্ঞান-বিজ্ঞান সংস্কৃতির চর্চায় উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছেন।

যাই হোক্, এইসব পারিবারিক গাণিতিক ঐতিহ্য লক্ষ্য করলে দেখা যায়, এঁদের মৌলিক অবদান তেমন বিশেষ কিছু নেই। কিন্তু তাঁরা গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা বজায় রেখেছিলেন, নানা বাধা বিপত্তির মধ্য দিয়েও জ্ঞানের প্রদীপ শিখাটি জ্বালিয়ে রেখেছিলেন, এটা কম কৃতিত্বের নয়। তাঁদের অধিকাংশই মৌলিক গ্রন্থ রচনা করেননি, পূর্ববর্তী গণিতাচার্যদের বিখ্যাত গ্রন্থের ভাষ্য টীকা রচনা করে গেছেন। এসব গ্রন্থ পূর্বাচার্যদের জটিল বিষয় বুঝতে অনেক সাহায্য করেছে, সন্দেহ নেই।

সামান্য পুনরাবৃত্তি

ইতিপূর্বে আমরা গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিদ পরমেশ্বরের নাম করেছি। 'বট-শ্রেণী'র এই পরিবারও গণিতজ্ঞ পরিবার। পরমেশ্বরের পিতামহ ছিলেন জ্যোতির্বিদ, পরমেশ্বর স্বয়ং বিখ্যাত গণিতজ্ঞ ও দৃগ্‌গণিত পদ্ধতির আবিষ্কারক এবং তাঁর সুযোগ্য পুত্র দামোদর ছিলেন গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিদ। নীলকণ্ঠের মত প্রতিভাবান ছাত্রের গুরু, এটাও কম গৌরবের নয়। নীলকণ্ঠ ছিলেন মৌলিক প্রতিভাসম্পন্ন গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিদ, আর তাঁর ভাই শঙ্করও গণিতে পারদর্শী ছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই।

এখানে সাধারণভাবে এবং পূর্বালোচিত কয়েকজন গণিতজ্ঞ ও তাঁদের পারিবারিক ঐতিহ্য স্মরণ করা হলো মাত্র। এবার কয়েকটি পরিবারের কথা বলা যাক।

গঙ্গাধর পরিবার

চতুর্দশ শতাব্দীতে এই পরিবার গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিজ্ঞানী হিসাবে খ্যাতি অর্জন করে। এই পরিবারে দু-জন গণিতজ্ঞ দেখা যায়। তাঁরা দু-ভাই—গঙ্গাধর ও বিষ্ণু। এই পরিবার গুজরাটের অন্তর্গত। গঙ্গাধর দু'খানি ভাষ্য রচনা করেন। দুটিই ভাস্করাচার্যের 'সিদ্ধান্ত শিরোমণি'র ওপর। একটি লীলাবতী অর্থাৎ পাটীগণিত অংশের ওপর, এবং অপরটি

বীজগণিতের। গঙ্গাধরের লীলাবতীর ওপর ভাষ্য খুব মূল্যবান বলে বিবেচিত হয়। এই বইটির ওপর নির্ভর করে প্রাচ্যবিদ টি. এইচ. কোলব্রুক ভাস্করের বীজগণিত অংশ ইংরেজীতে অনুবাদ করেন।

গঙ্গাধরের সুযোগ্য ভাই বিষ্ণুও মৌলিক চিন্তার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি পাটীগণিত বিষয়ে একটি বই লেখেন, বইটির নাম 'গণিতসার'। তাঁর বইটি অবশ্য আচার্য শ্রীধরের ত্রিশতিকা'র আদর্শে রচিত। তাঁর গ্রন্থে 'ত্রিশতিকা'র অনেক উদ্ধৃতি যায়।

জ্ঞানরাজ পরিবার

পুণ্যসলিলা গোদাবরী যেখানে বিদর্ভের সঙ্গে মিলিত হয়েছে সেখানে ছিল একটি গ্রাম। এই গ্রামে বাস করতেন জ্ঞানরাজ। সেই গ্রামের নামটি সুন্দর—পার্থপুর। এই গ্রামে জ্ঞানরাজ 1503 খ্রীস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। পার্থপুরে জ্ঞানরাজ অধ্যাপনা করতেন। কেবলমাত্র অধ্যাপনাই নয়, গাণিতিক ও জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক ঐতিহ্য সৃষ্টি করে প্রকৃত উত্তরাধিকারী গড়ে তোলার প্রয়াস করতেন। এইভাবে তাঁর সুযোগ্য শিক্ষায় তাঁর পুত্র সূর্যদাস গণিতে বিশেষ পারদর্শী হয়ে ওঠেন। কেবলমাত্র পুত্রই নয়, তাঁর শিষ্যদের মধ্যে কেউ কেউ খ্যাতিসম্পন্ন হয়ে ওঠেন। তাঁর এক সুযোগ্য শিষ্যের নাম ধুন্ধিরাজ।

জ্ঞানরাজ ভাস্করাচার্যের 'সিদ্ধান্তশিরোমণি'-র বীজগণিত অংশের ওপর ভাষ্য রচনা করেন। কিন্তু তাঁর আর একটি জনপ্রিয় গ্রন্থ রয়েছে। সেটি জ্যোতির্বিজ্ঞান সংক্রান্ত সঙ্কলন গ্রন্থ। নাম 'সিদ্ধান্ত সুন্দর'। এই বইটি লিখেই নাকি তিনি সবচেয়ে বেশী সম্মান ও খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

জ্ঞানরাজের পুত্র সূর্যদাসের জন্ম 1541 খ্রীস্টাব্দ। পিতার কাছে লেখাপড়া শিখেই তিনি গণিতজ্ঞ হন। পিতার মত তিনিও ভাস্করের বীজগণিতের ওর একটি ভাষ্য রচনা করেন। গণিতে তাঁর মৌলিক চিন্তা-ভাবনা ছিল। পাটীগণিতের একটি বইও লেখেন তিনি। বইটির নাম 'গণিতামৃতকূপিকা'। অবশ্য তাঁর যে দুটি বই-এর নাম জানা গেছে,

সে দুটি ভাষ্য গ্রন্থ। প্রথম বইটির নাম 'সূর্যপ্রকাশ'। এই বই-ই ভাস্করাচার্যের 'সিদ্ধান্ত শিরোমণি'র পাটীগণিত ও বীজগণিত অংশের ভাষ্য।

ধুন্ধিরাজ জ্ঞানরাজের প্রিয় শিষ্য। তাঁর কোন গ্রন্থ আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি। আর তিনি গণিত বা জ্যোতির্বিজ্ঞানের ওপর কোন গ্রন্থ রচনা করেছিলেন কিনা, তাও জানা যায়নি। তবে জানা যায় জ্যোতির্বিজ্ঞানে তাঁর প্রচুর উৎসাহ ও আগ্রহ ছিল। সূর্যদাস ও ধুন্ধিরাজ সমবয়সী। উভয়েই 1541 খ্রীস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।

কেশব-পরিবার

নন্দীগ্রাম নামটি খুবই পুরোনো। মহাকাব্যেও এই নাম দেখা যায়। এখন যেখানে বোম্বাই শহর সেখান থেকে 40 মাইল দূরে আরব সাগরের তীরে নন্দীগ্রামের অবস্থান। কেশব-পরিবারের আবাসস্থল নন্দীগ্রাম। গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চায় এই পরিবারের নামডাক কম নয়। কমপক্ষে চারজন গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিজ্ঞানী এই পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। সবাই মৌলিক প্রতিভার অধিকারী না হলেও অন্তত একজন প্রকৃতপক্ষে গাণিতিক প্রতিভার অধিকারী ছিলেন।

পরিবারের প্রথম গাণিতজ্ঞের নাম কেশব। কেশব সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় না। তবে জ্যোতির্বিজ্ঞানী হিসাবে তাঁর নাম ছিল। আর সবচেয়ে বড় কথা, তাঁর পুত্র গণেশের গাণিতিক প্রতিভা উন্মেষে তাঁর অবদান শ্রদ্ধার সাহিত স্মরণযোগ্য। এতো জানা কথা, প্রতিভা থাকলেই হয় না—বিকশিত হবার অনুকূল পরিবেশ চাই। উপযুক্ত পরিবেশ ও শিক্ষা না পেলে প্রতিভার বিকাশ হয় না। গাছ লাগালেই গাছ হয় না, গাছের যত্ন নিতে হয়, কখন কি দরকার সেদিকে প্রখর দৃষ্টি রাখতে হয়। যাই হোক, ষোড়শ শতাব্দীতে গণেশ দৈবজ্ঞের মত যে প্রতিভাশালী গণিতজ্ঞের দেখা পাওয়া যায়, তার জন্য কেশবের অবদানের তুলনা নেই।

গণেশ দৈবজ্ঞ এই পরিবারের শ্রেষ্ঠ গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিদ।

প্রকৃতপক্ষে, গণেশের জন্যই নন্দীগ্রামের এই ব্রাহ্মণ পরিবারটির খ্যাতি। গণেশের মৌলিক প্রতিভার পরিচয় তাঁর একটি মাত্র গ্রন্থ থেকেই বোঝা যায়। বইটির নাম 'বুদ্ধিবিলাসিনী'।

অনেকে বলেন, ভাষ্যরচনা মানে চর্বিতচর্বণ এতে লেখকের মৌলিকতা ও প্রতিভার তেমন পরিচয় পাওয়া যায় না। কারণ, ভাষ্যে মূল বই-এর উপদানের আলোচনা থাকে, এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সমালোচনা ও বিচার-বিশ্লেষণ থাকে। কিন্তু এরকম বই-এর মধ্যেও প্রতিভার স্বাক্ষর ও মৌলিকতার পরিচয় প্রদান করা যায়। অন্তত 'বুদ্ধিবিলাসিনী'-তে সে-রকম আছে। 'বুদ্ধিবিলাসিনী' ভাস্করাচার্যের লীলাবতী-র ভাষ্য। গণেশ তাঁর ভাষ্যে নানা ধরনের উদাহরণের সমাবেশ ঘটিয়ে এমন চমৎকারভাবে বিষয় বিন্যাস করেছেন যে, প্রতিভা ও মৌলিকতা না থাকলে এমনটি হয় না। পণ্ডিতরা একে ক্লাসিকের পর্যায়ভুক্ত বলে মনে করেন।

জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কে গণেশের আরো একটি বই আছে। বইটির নাম 'গ্রহলাঘব'। এটি খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। আনুমানিক 1507 খ্রীস্টাব্দে গণেশ জন্মগ্রহণ করেন।

কেশবের পর এই পরিবারের গাণিতিক ঐতিহ্য সঞ্চারিত করার দায়িত্ব স্বাভাবিক ভাবেই গণেশের ওপর বর্তায়। তাঁর শিক্ষায় ভাইপো নৃসিংহ জ্যোতির্বিজ্ঞানের পারদর্শী হয়ে ওঠেন। শুধু তাই নয়, ভাগিনেয় লক্ষ্মীদাসের গণিতে ও জ্যোতির্বিজ্ঞানে অনুরাগ দেখে তিনি স্বয়ং তাঁর শিক্ষার ভার গ্রহণ করেন। লক্ষ্মীদাসও জ্যোতির্বিজ্ঞানী হয়ে ওঠেন। গণেশ যে আদর্শ ও সফল শিক্ষক ছিলেন তার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর এক সফল ও কৃতী শিষ্যের মাধ্যমে। ইনি দিবাকর। দিবাকার কিভাবে পারিবারিক গাণিতিক ঐতিহ্য গড়ে তোলেন, সে কাহিনী কম আকর্ষণীয় নয়।

দিবাকর-পরিবার

দিবাকর গোলগ্রামের অধিবাসী। এই বিখ্যাত গ্রামটি গোদাবরী নদীর উত্তর তীরে মহারাষ্ট্রের অন্তর্গত। তাঁর গুরু বিখ্যাত গণেশ দৈবজ্ঞ।

গুরুর কাছে অধ্যয়ন সমাপ্ত করে গ্রামে ফিরে আসেন তিনি। তাঁর গাণিতিক ও জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও অধ্যাপনা এখানেই শুরু হয়।

দিবাকরের মত সৌভাগ্যবান পিতা কম দেখা যায়। তাঁর পাঁচ পুত্র, তাঁরা সবাই গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞানে কৃতিত্ব ও খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর পাঁচ পুত্র হলেন কৃষ্ণ, বিষ্ণু, মল্লারী, কেশব ও বিশ্বনাথ। জ্যেষ্ঠ পুত্র কৃষ্ণ 1561 খ্রীস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন, বিষ্ণু 1566, মল্লারী 1571 ও বিশ্বনাথ 1578 খ্রীস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু কেশবের জন্ম তারিখ জানা যায় না। পাঁচ ভায়ের মধ্যে মল্লারী ও বিশ্বনাথ অধিকতর কৃতিত্ব দেখান,। তাঁদের রচিত ভাষ্যগ্রন্থ এই কৃতিত্বের স্বাক্ষর বহন করে চলেছে।

কেবল পিতা হিসাবেই নয়, পিতামহ হিসাবেও দিবাকরের গর্ব করার যথেষ্ট কারণ ছিল। তাঁর জ্যৈষ্ঠ পুত্র কৃষ্ণের এক পুত্র ছিল। নাম নৃসিংহ। নৃসিংহ গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞানে পারিবারিক ঐতিহ্য বজায় রেখে কীর্তি স্থাপন করেন।

নৃসিংহের পুত্ররা আরো কৃতিত্ব দেখান। তাঁর চার পুত্র—দিবাকর, কমলাকর, গোপীনাথ, ও রঙ্গনাথ। খুব সম্ভব, কৃতী পিতামহের নাম স্মরণ করে রাখার জন্যই নৃসিংহ তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রের নামকরণ করেন দিবাকর।

যাই হোক, কৃষ্ণের চার নাতির মধ্যে দু-জন খুবই বিখ্যাত হন। কমলাকরের জন্ম 1616 খ্রীস্টাব্দে, আর রঙ্গনাথের 1640 খ্রীষ্টাব্দে। কমলাকর 'সিদ্ধান্তবিবেক' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। এতে খ্যাতি ও প্রতিপত্তি তিনি দুটিই লাভ করেন। তা ছাড়া কমলাকরের একটি বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে লক্ষ্য করার মত। তিনি কেবল দেশীয় গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞানে পাণ্ডিত্য অর্জনই করেননি, আরবীয় ও পারসীয় গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞানে তাঁর প্রভূত দখল ছিল। তা ছাড়া আরবীয় গণিতের মাধ্যমে তিনি ইউক্লিডের জ্যামিতির সহিতও পরিচিত হন। দীর্ঘদিন ধরে ভারতীয় গণিতজ্ঞ ও ভাষ্যকারগণ পূর্বাচার্যদের গ্রন্থগুলির আলোচনা করে আসছিলেন। কমলাকর এক নতুন রীতির প্রবর্তন

করলেন। ইউক্লিড ও পারসীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানের ওপর ভিত্তি করে ভাস্করাচার্যের গ্রন্থের আলোচনা শুরু করলেন। এই নতুন রীতি তাঁর 'সিদ্ধান্ত' গ্রন্থে দেখা যায়। ভারতীয় গণিত আন্তর্জাতিক গণিতের পরিপ্রেক্ষিতে তুলনীয় হলো।

কমলাকরের ছোট ভাই রঙ্গনাথও কম যান না। তিনিও গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞানে খ্যাতি লাভ করেন। এবং একটি ভাষ্য গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর ভাষ্য গ্রন্থটির নাম 'মিতভাষিণী'। এটি আচার্য ভাস্করের লীলাবতীর অংশের ভাষ্য।

দিবাকর প্রবর্তিত পারিবারিক গাণিতিক ঐতিহ্য দীর্ঘদিন বজায় ছিল। বংশ পরম্পরায় এই বংশে অনেক গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিজ্ঞানী জন্মগ্রহণ করেছেন। অবশ্য তাঁরা সবাই যে সমান কৃতী হয়েছেন, একথা বলা যায় না। কিন্তু তাঁদের প্রচেষ্টা ও কর্মকৃতি দেশের গৌরব ও মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে, এ-সম্পর্কে বিন্দুমাত্র সংশয় নেই।

বল্লাল—পরিবার

না, এ-বল্লাল সে-বল্লাল নয়। বল্লাল নাম দেখেই মনে হতে পারে ইনি হয়তো ইতিহাসের বল্লাল সেন। না, আমরা রাজা বল্লাল সেন বা তাঁর পরিবারের কথা বলছি না। বলা বাহুল্য, এখানে এক গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিদ বল্লাল-পরিবারের কথা বলা হচ্ছে।

এই বল্লাল পরিবারের আদি বাসস্থান ছিল মধ্যপ্রদেশের ইলাচপুর গ্রামে। জানা যায়, এই পরিবারের পূর্বপুরুষরা গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞানে আগ্রহী ছিলেন। এ-বিষয়ে নাকি তাঁদের নামও ছিল। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, এই পরিবারের গাণিতিক ঐতিহ্য বেশ পুরোনো। তাহলেও কিন্তু বল্লালের আগে এই পরিবারের কোন গণিতজ্ঞের নাম জানতে পারা যায় না। খুব সম্ভব তাঁরা হয়তো অধ্যয়ন অধ্যাপনায় নিজেদের নিয়োজিত রেখেছিলেন, কোন গ্রন্থ রচনা করেননি।

বল্লাল এই ধারাই অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন। তাঁর রচিত কোন গ্রন্থও

পাওয়া যায় না সত্য, কিন্তু তিনি গণিতে উৎসাহী ও আগ্রহী ছিলেন। তবে তাঁর পুত্ররা পিতাকে অতিক্রম করতে সমর্থ হয়েছিলেন। গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিজ্ঞানী হিসাবে তাঁরা যথেষ্ট সম্মান অর্জন করেন।

বল্লালের পাঁচ ছেলে। গোলগ্রাম নিবাসী দিবাকরের যত কৃতী পাঁচ পুত্রের পিতা হিসাবে তিনি নিশ্চয় ভাগ্যবান। তাঁর পাঁচ ছেলের মধ্যে কৃষ্ণ ও রঙ্গনাথ গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞানে প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেন।

কৃষ্ণ ছিলেন গোলগ্রামের বিখ্যাত দিবাকরের পুত্র বিষ্ণুর শিষ্য। দিবাকর পরিবারে অধ্যয়ন করার সুযোগ পাওয়া কম সৌভাগ্যের কথা নয়। তবে কৃষ্ণও মেধা ও বুদ্ধি বলে সেখানে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন বলে ধারণা করা যায়। মেধাবী কৃষ্ণ গোলগ্রামে পড়াশোনা শেষ করে নিজ গ্রামে ফিরে আসেন। এবং ইলাচপুরেই অধ্যাপনা ও গবেষণায় মনোনিবেশ করেন।

কৃষ্ণের খ্যাতি কেবলমাত্র ইলাচপুর বা গোলগ্রামে সীমাবদ্ধ ছিল না। তাঁর খ্যাতি ভারতের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। তাই সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজদরবারে তাঁর ডাক পড়ে। তিনি মুঘল রাজসভায় প্রধান জ্যোতির্বিদের পদলাভ করেন। লক্ষণীয়, মুঘল রাজারা অনেকে বিদ্বান ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। বিশেষত, জাহাঙ্গীরের প্রকৃতি প্রেমিক বলে যথেষ্ট সুনাম ছিল।

বড় রাজসম্মান পেয়ে কৃষ্ণ বিলাস-ব্যসনে জীবনযাত্রা অতিবাহিত করেন নি। অনেক বিষয়ের ওপর তিনি গ্রন্থ রচনা করেন। ভাস্করাচার্যের বীজগণিতের ওপর যে ভাষ্যগ্রন্থটি রচনা করনে, তার নাম 'নবাঙ্কুর'। লীলাবতীর ওপরে তাঁর ভাষ্য দেখা যায়। নাম 'কল্পলতাবতার'।

ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানে 'সূর্যসিদ্ধান্ত' অতি প্রাচীন গ্রন্থ। এই গ্রন্থের বিবরণ লেখেন রঙ্গনাথ। সহজ ও সরল বর্ণনার জন্য তাঁর বিবরণী খুবই জনপ্রিয় হয়। বস্তুত 'গূঢ়ার্থপ্রকাশ' তাঁকে প্রভূত যশ ও সম্মানের অধিকারী করে তোলে।

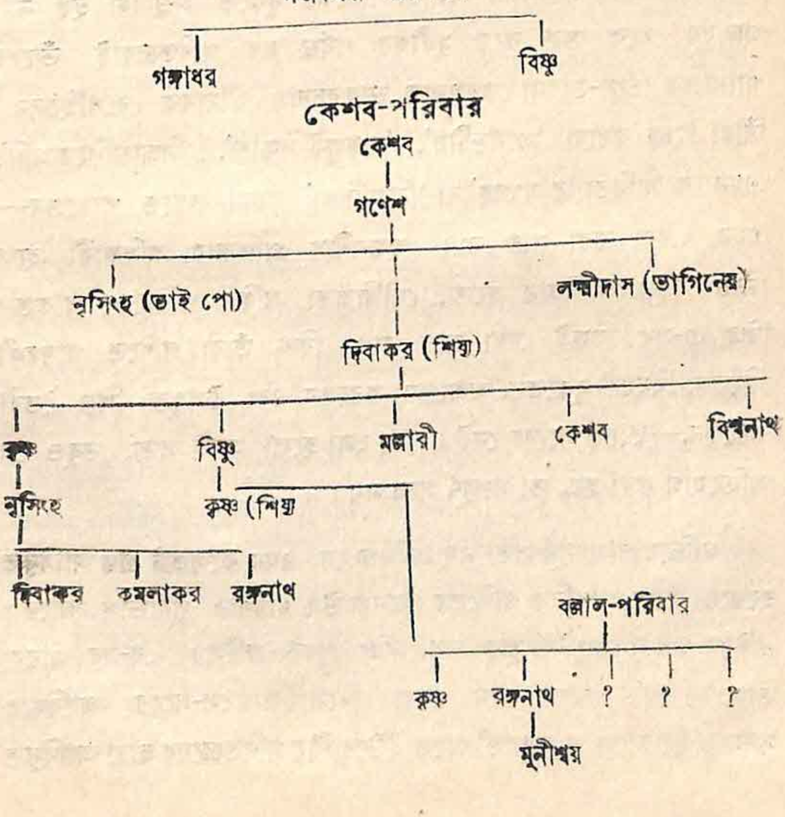
রঙ্গনাথের পুত্র বল্লাল পরিবারের গাণিতিক ঐতিহ্য বহন করে চলেন।

রঙ্গনাথের পুত্র মুনীশ্বর। ইনি ছিলেন ভাস্করাচার্যের অনুরাগী ও ভক্ত। কমলাকর ভাস্করাচার্যের জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্বন্ধে তীব্র সমালোচনা করেন, কিন্তু মুনীশ্বর তার প্রতিবাদ করেন। ইনি 'মরীচি' নামে 'সিদ্ধান্ত-শিরোমণি'-র টীকা রচনা করেন। তা ছাড়া লীলাবতীর ওপর ভাষ্য রচনাও করেন।

গণিতে মুনীশ্বরের মৌলিক চিন্তা-ভাবনা দেখা যায়। পূর্বপুরুষদের গাণিতিক ও জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক ঐতিহ্য বহন করার যোগ্য উত্তরাধিকারী ছিলেন তিনি। তিনি পাটীগণিত গ্রন্থও রচনা করেন। নাম 'পাটীসার'।

এতক্ষণ আমরা যে-সব গাণিতিক পরিবারের কথা আলোচনা করলাম, তাতে কার সঙ্গে কার কি সম্বন্ধ ইত্যাদি ছকের মধ্য দিয়ে দেখানো হলো।

গঙ্গাধর-পরিবার



আধুনিক গণিতের পূর্বাভাস

পরমেশ্বর, নীলকণ্ঠ, অচ্যুত ও যে-সব গাণিতিক পরিবারের কথা আলোচিত হলো, তাঁদের বিবরণ পড়ে স্বাভাবিকভাবেই আমাদের এরূপ ধারণা হয় যে, আচার্য ভাস্করের পর অর্থাৎ দ্বাদশ শতাব্দীর পর থেকে ভারতীয় গণিতের অগ্রগতি বিশেষ কিছুই হয়নি। ভাস্কর পরবর্তী গণিতজ্ঞরা নতুন কিছু সংযোজন বা আবিষ্কার করেনি, কেবল পূর্বাচার্যদের আবিষ্কৃত তথ্য ও তত্ত্বের বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন, স্পষ্ট করার ও অধিকতর বোধগম্য করার প্রয়াস পেয়েছেন মাত্র। সত্যিকার দেখলে, ভারতীয় গণিতে তাঁদের অবদান সম্পর্কে উল্লেখ করার কিছু নেই। এই অভিযোগ একেবারে মিথ্যা নয়, আবার সর্বাংশে সত্য তা-ও বলা যায় না।

অভিযোগে যে মিথ্যা নয়, তা পাঠকের বুঝতে অসুবিধা হয় না। গঙ্গাধর থেকে শুরু করে মুনীশ্বর পর্যন্ত সব গণিতজ্ঞরাই তাঁদের গাণিতিক চিন্তা-ভাবনা কেবলমাত্র ভাষ্যরচনায় সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন। তাঁরা ইচ্ছে করলে 'আর্যভটীয়', 'ব্রহ্মস্ফুটসিদ্ধান্ত', 'সিদ্ধান্তশিরোমণি', এমন কি 'গণিতসার সংগ্রহ' বা 'ত্রিশতিকা' রচনা করতে পারতেন— এমন ধারণা করা যায় না। সৃজনশীল প্রতিভার অধিকারী হলে নিশ্চয় নতুন আবিষ্কার হতো, মৌলিকতা অধিক পরিমাণে থাকত। কিন্তু এ-সব কিছুই দেখা যায় না। কিন্তু তাঁরা গণিতে পারদর্শী ছিলেন, বিষয়টি বুঝতেন, অধ্যাপনা করতেন এবং উপযুক্ত শিষ্য তৈরী করতেন,—তাতে সন্দেহ নেই। যা বলা হলো সবই সত্য, তবুও যে অভিযোগ করা হয়, তা সম্পূর্ণ সত্য নয়।

অভিযোগ সম্পূর্ণ সত্য নয় এইজন্য যে, এমন কয়েকটি গ্রন্থ আবিষ্কৃত হয়েছে যাতে আধুনিক গণিতের অনেক উচ্চ ধারণার পূর্বাভাস আছে। এইসব ধারণা মোটেই তুচ্ছ নয়, বরং খুবই জটিল। যে-সব ধারণা ভারতীয় গণিতজ্ঞদের মনে দেখা দিয়েছিল সে-সবের আবিষ্কার সমসাময়িককালে ও পরবর্তীকালে ইউরোপীয় গণিতজ্ঞদের দ্বারা আবিষ্কৃত

হয়। ভারতীয় গণিতজ্ঞরা সূত্রাদি আবিষ্কার করেছিলেন তাঁদের নিজস্ব রীতি ও বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী; আর পাশ্চাত্য গণিতজ্ঞরাও তাঁদের বৈশিষ্ট্য ও রীতি অনুযায়ী তাঁদের সূত্র দিয়েছেন।

ভারতে তিনটি গ্রন্থের মধ্যে আধুনিক উচ্চ-গণিতের নিয়ম ও সূত্র দেখতে পাওয়া যায়। এই গ্রন্থ তিনটির নাম 'যুক্তিভাষা' বা 'গণিত-যুক্তিভাষা', 'করণপদ্ধতি' ও 'সদরত্নমালা'।

'যুক্তিভাষা' গ্রন্থের লেখকের নাম আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। তাঁর নাম জ্যেষ্ঠদেব। ইনি বিখ্যাত অচ্যুত পিষারতির গুরু। কিন্তু 'যুক্তিভাষা'-য় আলোচিত নিয়ম ও সূত্রের আবিষ্কারক তিনি নন, মাধব নামে অন্য এক গণিতজ্ঞ। এই মাধব সঙ্গমগ্রামের মাধব নামে পরিচিত। আনুমানিক 1340 খ্রীস্টাব্দে তাঁর জন্ম ও মৃত্যু 1425 খ্রীস্টাব্দে। জ্যেষ্ঠদেবকে ধন্যবাদ, তিনি তাঁর গ্রন্থে মাধব আবিষ্কৃত নিয়ম-সূত্রের আলোচনা করেছেন। তা না হলে হয়তো প্রাচীন ভারতের বহু মূল্যবান বিষয় যেমন অবলুপ্ত হয়ে গেছে, তেমনি মাধবের গবেষণাও অবলুপ্ত হতো।

টেলার—নিউটন—লিবনিজের পূর্বে

উচ্চ গণিতে 'টেলার সিরিজ' নামে একটি সূত্র আছে। টেলার সাহেব এই সূত্রের আবিষ্কারক বলে এরূপ নামকরণ হয়েছে। এই সূত্রটি মাধব টেলারের পূর্বেই আবিষ্কার করেন। আবার মহাবিজ্ঞানী ও গণিতজ্ঞ নিউটন সাইন (Sinx) ও কোসাইন (Cosx) সূত্র আবিষ্কার করেন। এই সূত্র দুটির আবিষ্কারকও আচার্য মাধব। এবং তিনি যে নিউটনের পূর্বেই আবিষ্কার করেন, তা বোধ করি না বললেও চলবে। লিবনিজের নাম দার্শনিক হিসাবে। কিন্তু তিনি গাণিতিক আবিষ্কারেও অমর কীর্তি স্থাপন করে গেছেন। কলন আবিষ্কারে নিউটনের সহিত তাঁর নাম সমানভাবে উচ্চারিত হয়। তা ছাড়া আপেক্ষক গবেষণাতেও তাঁর নাম কম নয়। এই জার্মান দার্শনিক ও গণিতজ্ঞ পাই (π)-এর মান নির্ণয়ের একটি সূত্র দেন। কিন্তু আশ্চর্যের

বিষয়, আচার্য মাধব একই সূত্র আবিষ্কার করেন লিবনিজের প্রায় দু'শ' বছর আগে।

ভারতীয় গণিতাচার্য কর্তৃক উচ্চ গণিতের গবেষণার কয়েকটি সূত্রের উল্লেখ করা হলো। এ-সব ছাড়াও আরো কয়েকটি উচ্চ গণিতের সূত্র তাঁরা আবিষ্কার করেছিলেন। অথচ সেইসব সূত্র আবিষ্কার হতে ইউরোপের অনেক সময় লেগেছে—শত শত বছর। সুতরাং মধ্যযুগে ভারতীয় গণিতজ্ঞরা সকলেই চর্বিতচর্বন করেছেন বলা যায় না। এর ব্যতিক্রমও লক্ষ্য করা যায়।

সোয়াই জয় সিংহ

গণিতের পৃষ্ঠপোষক হিসাবে রাজা-মহারাজাদের নাম আছে সত্য, কিন্তু তাঁরা গাণিতিক আবিষ্কার বা গবেষণা করেছেন, এমনটি প্রায় দেখা যায় না। সিরাকুজের রাজা হীরন ও তাঁর পুত্র গ্যালন বিশ্ববিশ্রুত গণিতজ্ঞ ও বিজ্ঞানী আর্কিমিডিসের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। মিশরের টলেমীরা তো গণিতচর্চার ক্ষেত্রে বিশেষ আনুকূল্য দেখাতেন। তাঁদের প্রচেষ্টায় ও আনুকূল্যে আলেকজান্দ্রিয়া বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে ওঠে। মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে আলেকজান্দ্রিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদানের তুলনা হয় না। এখানেই ইউক্লিড তাঁর জ্যামিতি গ্রন্থ 'এলিমেণ্টস' রচনা করেন। রাশিয়ার সম্রাজ্ঞী ক্যাথারীন গণিতজ্ঞদের বিশেষ সমাদর করতেন। তাঁর সভায় বিখ্যাত অয়লার ছিলেন। জার্মানীর এক ডিউক ফার্ডিন্যাণ্ডের সাহায্য না পেলে গাউসের মত বিশ্বগণিতের শ্রেষ্ঠ প্রতিভা বিকশিত হতো কিনা সন্দেহ। তিনি শুধুমাত্র গাউসের পড়ার খরচই বহন করেননি, তাঁর বিখ্যাত গবেষণা গ্রন্থ প্রকাশে অর্থ সাহায্য করেছিলেন। তা ছাড়া নেপোলিয়ান গণিতজ্ঞদের বিশেষ সমাদর করতেন। তাঁর সময়েই ফ্রান্সে বিখ্যাত গণিতজ্ঞরা জন্মান। ল্যাপলাস, মঙ্গ প্রমুখের নাম এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে। আমাদের দেশেও এরকম উদাহরণের অভাব নেই। দক্ষিণ ভারতের রাজা অমোঘবর্ষ মহাবীরাচার্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন ; রাজা জগতুঙ্গও গণিতজ্ঞদের সমাদর

করতেন। মধ্যযুগে কয়েকজন মুসলমান শাসনকর্তাও গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিদদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। জাহাঙ্গীরের নাম আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। কিন্তু স্বয়ং রাজা-মহারাজাদের গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞানচর্চা



বিরল ঘটনা। একমাত্র ব্যতিক্রম অষ্টাদশ শতাব্দীর অম্বরের রাজা জয় সিংহ। অসি ও মসি চালনায় এমন সিদ্ধহস্ত বিশ্বগণিতের ইতিহাসে দেখা যায় না।

জীবন কথা

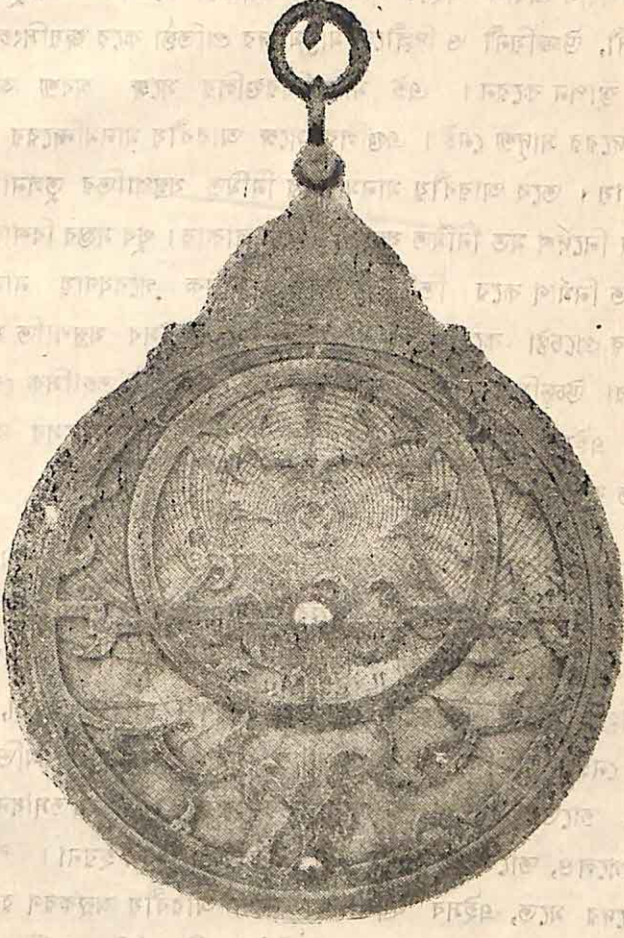
ঔরঙ্গজেবের বিখ্যাত সেনাপতি জয় সিংহের নাম সর্বজনবিদিত। দাক্ষিণাত্য থেকে প্রত্যাবর্তনের পর 1617 খ্রীস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। তখনো তাঁর উত্তরাধিকারী দ্বিতীয় জয় সিংহের জন্ম হয়নি। দ্বিতীয় জয় সিংহ 1686 খ্রীস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। এবং মাত্র তেরো বছর বয়সে সিংহাসনে আরোহন করেন। কিন্তু তাঁর শত্রুর অভাব ছিল না। তাই রাজা হিসাবে পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হতে তাঁর সময় লেগেছিল। বহু বাধা-বিঘ্নের মধ্য দিয়ে 1708 খ্রীস্টাব্দের মধ্যে তিনি সমগ্র রাজ্যের অধিকার লাভ করেন। তখন দিল্লীর সুলতান মুহম্মদ শাহ। তিনি মুহম্মদ শাহের প্রিয়পাত্র ছিলেন। এবং 1719 খ্রীস্টাব্দে আগ্রা ও মালবের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। শাসনকর্তা ও সৈন্যাধ্য হিসাবে যেমন তাঁর খ্যাতি ছিল, তেমনি বিদ্বান ও পণ্ডিত হিসাবে তাঁর সম্মান ও মর্যাদার আসন ছিল।

কীর্তি-গাথা

তাঁর প্রতিষ্ঠিত নতুন রাজধানীর নাম জয়নগর বা জয়পুর। তাঁর সময়ে জয়পুর বিদ্যাচর্চার শ্রেষ্ঠ কেন্দ্রে পরিণত হয়। এখানে জ্যোতির্বিজ্ঞান সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণ ও গবেষণার জন্য তিনি একটি মানমন্দির (Observatory) প্রতিষ্ঠা করেন। বলা বাহুল্য, জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক গবেষণায় মানমন্দিরের গুরুত্ব অপরিসীম।

জয় সিংহ অতি অল্প বয়সেই জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রতি আকৃষ্ট হন। সম্ভবত প্রখ্যাত গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিদ জগন্নাথ পণ্ডিতের প্রভাবে তিনি ওই বিষয়ে অনুরক্ত হয়ে থাকবেন। যাই হোক, অবিরাম অধ্যয়নের মধ্য দিয়ে তিনি জ্যোতির্বিজ্ঞানের নীতি-নিয়মসমূহ আয়ত্ত করে ফেলেন। জ্যোতির্বিজ্ঞানে নানা বিষয়ের ওপর সারণী থাকে। তখন প্রচলিত সারণীতে ত্রুটি দেখে তিনি স্বয়ং সংশোধন ও সংস্কারে মনোনিবেশ করেন। সেজন্য দিল্লী মানমন্দিরে একাদিক্রমে সাত বছর গ্রহ ও নক্ষত্রাদি পর্যবেক্ষণ, গবেষণা ও তথ্যাদি বিশ্লেষণ করেন।

জ্ঞানার্জন ও সত্যানুসন্ধানে তাঁর কোনরূপ গোঁড়ামি ছিল না। তিনি কোন বিশেষ গোষ্ঠীভুক্ত ছিলেন না। হিন্দু, মুসলমান ও ইউরোপীয় জ্ঞানী-গুণীদের মতামত ও তাঁদের পদ্ধতি গ্রহণে তাঁর বিন্দুমাত্র দ্বিধা ছিল না। দেশী-বিদেশী জ্যোতির্বিজ্ঞানের বহু গ্রন্থ তিনি সংগ্রহ করেন।



অ্যাস্ট্রোল্যাব

বিদেশী গ্রন্থ, বিশেষত আরবীয় জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ বিশেষজ্ঞদের দিয়ে সংস্কৃতে অনুবাদ পর্যন্ত করান। বিখ্যাত জগন্নাথ পণ্ডিত এই

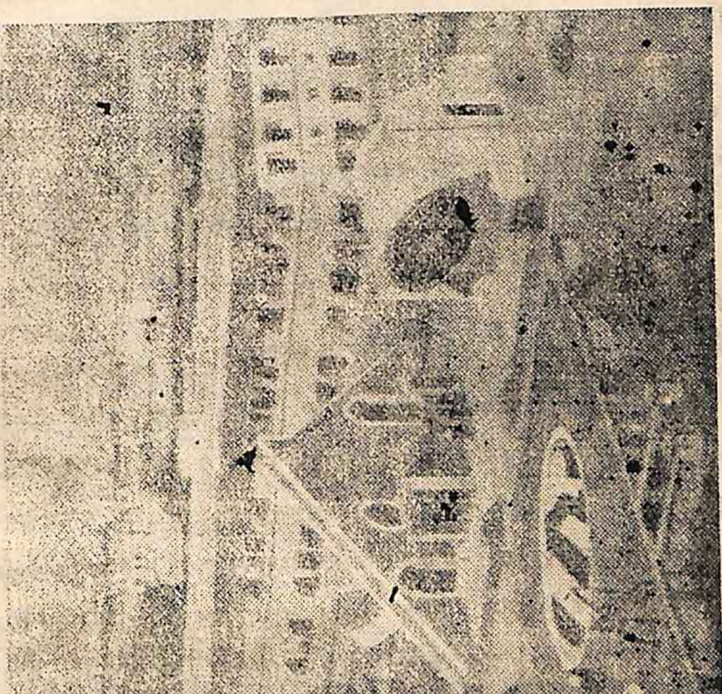
অনুবাদে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাছাড়া বিশ্বের অন্যত্র জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক গবেষণার খোঁজ-খবর নেওয়ার জন্য বিদেশে বিদেশী বিশেষজ্ঞ প্রেরণ করে নতুন চিন্তাভাবনার সহিত পরিচিত হবার প্রচেষ্টাও করেছিলেন।

ভারতে জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক গবেষণার উন্নতির জন্য জয়সিংহ দেশের পাঁচটি প্রধান প্রধান শহরে মানমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। জয়পুর, মথুরা বারানসী, উজ্জয়িনী ও দিল্লীতে মানমন্দির প্রতিষ্ঠা করে জয়সিংহ অক্ষয় কীর্তি স্থাপন করেন। এই মানমন্দিরগুলির সঙ্গে অবশ্য আধুনিক মানমন্দিরের সাদৃশ্য নেই। এগুলির সঙ্গে আরবীয় মানমন্দিরের সাদৃশ্য দেখা যায়। তবে আরবীয় মানমন্দিরে নির্মিত যন্ত্রপাতির তুলনায় জয় সিংহের নির্দেশ মত নির্মিত যন্ত্রপাতি বিশালাকার। খুব সম্ভব বিশালাকৃতি যন্ত্রপাতি নির্মাণ করে তিনি জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক গবেষণায় নানা ত্রুটি এড়াবার প্রচেষ্টা করেছিলেন। যাই হোক, এইসব যন্ত্রপাতি সম্পর্কে পণ্ডিতরা উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। যেমন, ঐতিহাসিক জে. টড বলেন, এইসব বিশালাকার যন্ত্রপাতি ভারতীয় ইতিহাসের অন্ধকার দূরীকৃত করেছে।

তাত্ত্বিক ও পরীক্ষামূলক গবেষণার মধ্যে শেষেরটির প্রতি মহারাজা জয় সিংহের বিশেষ আগ্রহ ও অনুরাগ দেখা যায়। জ্যোতির্বিজ্ঞানের যন্ত্রপাতি নির্মাণে অসামান্য পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষালব্ধ ফলের ভিত্তিতে যে তাঁর গবেষণা চালিত হতো, তাতে সন্দেহ নেই। তিনি যে-সব যন্ত্রপাতি নির্মাণ করেন তা অভিনব না হলেও, তাতে পূর্ব প্রচলিত যন্ত্রপাতির সংস্কার ও উন্নতিসাধন লক্ষ্য করা গেলেও, তাতে তাঁর প্রতিভার মৌলিকতা বিনষ্ট হয়না। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মতে, এইসব যন্ত্রপাতির মধ্যে আরবীয় অনুকরণ রয়েছে। কিন্তু মনে রাখা দরকার, ভারতে জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক ঐতিহ্য অতি প্রাচীন। সেই বৈদিক যুগ থেকে—ঋগ্বেদের সময় থেকে এই ঐতিহ্য চলে আসছে। এবং সুদীর্ঘ সময় ধরে গবেষণা ও আবিষ্কার হয়ে আসছে।

ভারতীয় যন্ত্রপাতি ও উত্তরাধিকার

বস্তুত পক্ষে, ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানে যন্ত্রের ব্যবহার নতুন নয়, ঋগ্বেদের যুগ থেকেই চলে আসছে। অত্রিমুনি 'তুরীয়যন্ত্র' ব্যবহার করে গ্রহণের রহস্যভেদ করেছিলেন ; 'অথর্ববেদে' শঙ্কুযন্ত্রের উল্লেখ দেখা যায়।



যন্তর-মন্তর (আলেখ্য পত্রিকার সৌজন্যে)

তা ছাড়া জ্যোতির্বিজ্ঞানের গ্রন্থসমূহে যন্ত্রপাতির ধারাবাহিক আলোচনা রয়েছে। ব্রহ্মগুপ্ত তো তাঁর ব্রহ্মস্ফুটসিদ্ধান্ত গ্রন্থে একটি সম্পূর্ণ অধ্যায় যন্ত্রপাতি নিয়েই আলোচনা করেছেন। 'ঘটীযন্ত্র' 'কপালযন্ত্র' 'শঙ্কু,'

'চক্র', 'চাপ', 'তুরীয়', 'পাঠী, ধনু', 'ফলকযন্ত্র' কত প্রকারের যন্ত্রই না প্রাচীন ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা ব্যবহার করতেন।

পণ্ডিতরা বলেন, প্রাচীন ভারতের ফলকযন্ত্র হচ্ছে যন্ত্ররাজ অর্থাৎ অ্যাস্ট্রোল্যাব (Astrolabe)। যন্ত্রনির্মাণের এই ভারতীয় ঐতিহ্য থেকে মনে হয়, যন্ত্রনির্মাণের প্রবণতা জয় সিংহের রক্ত-মজ্জায় ছিল। তিনি প্রকৃতপক্ষে আমাদের সুমহান প্রাচীন ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ধারক ও বাহক ছিলেন। আরব জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা যন্ত্রপাতি নির্মাণে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, সন্দেহ নেই। কিন্তু জয় সিংহ কেবলমাত্র তাঁদের অনুকরণ ও অনুসরণ করেছেন বললে সত্য কথা বলা হয় না। আরব জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের যন্ত্রপাতি দেখে তিনি অনুপ্রাণিত হতে পারেন। তবে এতে তাঁর মৌলিকতা হ্রাস পায় না।

কয়েকটির নাম ও অবস্থান

বেড়াতে কার না ভাল লাগে? পাহাড়-সমুদ্র দেখে যেমন আনন্দ হয়, তেমনি আবার বড় বড় শহরের নানা দর্শনীয় বস্তু দেখতেও মন উৎসুক হয়। ভারতের প্রধান প্রধান শহরগুলির আকর্ষণ অনেকেরই রয়েছে। কে না বোম্বাই-মাদ্রাজ-দিল্লি-আগ্রা-বারাণসী ইত্যাদি শহর দেখতে চায়? যাই হোক, দিল্লি গেলে প্রায় সবাই একটি দর্শনীয় বস্তু দেখে থাকেন। তার ছবি আগেই দেওয়া হয়েছে। যাঁরা দেখেছেন তাঁদের চিনতে কষ্ট হয় না। এমন কি, হয়তো অনেকে এই যন্ত্রের ওপরে চড়েও থাকবেন। কিন্তু গাইড না থাকলে বা পড়াশোনা না থাকলে এই যন্ত্রের কার্যকারিতা বোঝা সম্ভব নয়। যাই হোক, আমরা এখানে জয়সিংহ পরিকল্পিত ও নির্দেশিত কয়েকটি যন্ত্রের উল্লেখ করলাম। বিস্তারিত বিবরণ আগ্রহী পাঠক লেখকের 'প্রাচীন ভারতীয় গণিতের ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে দেখতে পারেন।

1) সম্রাট যন্ত্র: এই যন্ত্র দিল্লী, জয়পুর, বারাণসীতে নির্মিত হয়।

2) জয়প্রকাশ: এটি মাত্র দুটি স্থানে জয়পুর ও দিল্লীতে নির্মিত হয়।

3) রামযন্ত্র ঃ এটিও জয়পুর ও দিল্লীতে আছে।

4) দিগংশ যন্ত্র ঃ এই যন্ত্র তিনটি শহরে নির্মিত হয়—বারাণসী, জয়পুর ও উজ্জয়িনীতে।

5) দক্ষিণোবৃত্তি যন্ত্র ঃ জয়পুর, উজ্জয়িনী ও বারাণসীতে রয়েছে।

6) নাড়ি বলয় যন্ত্র ঃ জয়পুর, উজ্জয়িনী ও বারাণসীতে নির্মিত হয়।

7) বৃত্তি ষষ্ঠাংশ ঃ দিল্লী ও জয়পুরে নির্মিত হয়।

8) মিশ্র যন্ত্র ঃ দিল্লীতে স্থাপিত হয়। এটিতে একাধিক যন্ত্রের মিশ্রণ ঘটেছে।

9) রাশি বলয় ঃ মাত্র একটি স্থানে—জয়পুরে স্থাপিত হয়।

10) কপাল ঃ জয়পুরে স্থাপিত হয়।

উপসংহার

রাজ-রাজড়ার যুগ চলে গেছে। এখন গণতন্ত্র ও সাম্যের যুগ। ভারতের প্রতিটি নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য তাই বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই পূর্বতনদের সব কর্ম আমাদের ওপর এসে পড়েছে। ভারতের সুমহান ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির উন্নতি বৃদ্ধি যেমন করতে হবে, তেমনি আবার তাকে ধরে রাখা, বহন করার গুরু দায়িত্বও নিতে হবে। দেশের তরুণরাই জাতির শক্তি ও ভবিষ্যৎ। তাই তাদের আগ্রহী হয়ে নতুন নতুন আবিষ্কার ও উদ্ভাবনে দেশের সম্মান, মর্যাদা ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধির দায়িত্ব বহন করতে হবে—এমন প্রত্যাশা অন্যায় ও অসংগত নয়।